* বনফুল *

*** সে ও আমি ***

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক

ডাক্তার শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি.

শ্রীচরণকমলেষু—

* * * *

সে ও আমি

লিখতে শুরু করব, এমন সময় দেখি, সামনের চেয়ারে সে বসে আছে। এ রকম আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল, চিনি, কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি মনে পড়ল না। কিন্তু চেনা হলেও—এমন সময়ে হঠাৎ—

সে। কি দেখছেন অবাক হয়ে ?

আমি। দেখছি আপনাকে। ভাবছি, এত রাত্রে এই তেতলার ঘরে আপনি কি করে এলেন ?

সে। এসেছি যখন, তখন বুঝতেই পারছেন, আসাটা অসম্ভব নয়।

একটু চুপ করে রইলাম। অর্থাৎ আশা করে রইলাম যে, তার এই অপ্রর্ত্যাশিত আবির্ভাবের কারণটা সে ব্যক্ত করবে। কিন্তু সে-ও চুপ করে রইল।

আমি। এসেছেন কেন, কোনও দরকার আছে ?

সে। সেটা এখন নাই বা শুনলেন।

আমি। আমাকে আগে চিনতেন কি ?

সে। খুব। যদি বলি, আপনিই আমার একমাত্র পরিচিত লোক, তা হলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ? দেখুন তো ভালো করে।

আমি। মনে হচ্ছে চিনি, অথচ—কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সে। কোথাও দেখেন নি, অথচ—

একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

আমি। অথচ?

সে। অথচ সর্বদাই দেখছেন। আমার কথা থাক, আপনি কি করছেন এত রাত্রে একা বসে?

আমি। লিখছি।

সে। লিখছেন! আপনি যে লেখক তা তো জানা ছিল না আমার!

আমি। না, লেখক বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে, আমি ঠিক তা নই। তবু লিখছি।

সে। কি লিখছেন?

আমি। কাহিনী।

সে। প্রেমের? আজকালকার ছেলেরা—

আমি। দেখুন, আজকালকার ছেলেদের সমালোচনায় সবাই পঞ্চমুখ। দেশসুদ্ধ গোরু ওই একই জাবর কাটছে। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও হয়তো ভালো নয়, কিন্তু সেটা বার বার বলে লাভ কি!

সে। কারও স্বাধীন মতামত শুনতে ভয় পান? ডেমোক্র্যাসির যুগ এটা জানেন?

আমি। বিলক্ষণ জানি। স্বাধীন মতামত অনেক শুনেছি। কিন্তু এই নির্জন রাত্রে আপনার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে না ও কথা। আপনি আপনার পরিচয়টা দিন আগে।

চোখ দুটি হাসতে লাগল তার।

সে। যদি বলি, কৌতূহল সম্বরণ করুন।

আমি। কেন?

সে। আগেই পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই, দ্বিতীয়ত পুরো পরিচয় দেবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়, আমি নিজেই নিজেকে জানি না ভালো করে।

আমি। যতটুকু জানেন, ততটুকু শুনি না।

সে। শোনবার দরকার কি। খানিকটা পরিচয় তো পাচ্ছেন। দেখছেন, এই তো যথেষ্ট পরিচয়। বেশী কৌতূহল ভালো নয়।

আমি। কিন্তু আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার ঘরে এমন রাত-দুপুরে এসে—

সে। এটা আপনার ঘর নয়, এটা আপনার বাবার ঘর—

আমি। তার মানেই—

সে। না, তার মানেই তা নয়। বিশেষত আপনার বাবা যখন আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন ঠিক করেছেন, তখন—

আমি। কি করে জানলেন আপনি?

আবার একটু হাসল সে।

সে। আপনার সব খবর রাখি আমি। মিনতিকে বিয়ে করছেন না কেন?

আমি। মিনতিকে চেনেন নাকি?

সে। একটু একটু।

আমি। আপনি আমার সম্বন্ধে এত কথা জানেন, অথচ আমি আপনাকে চিনতেই পারছি না ভালো করে। কোথায় দেখা হয়েছিল বলুন তো—রমেশের বাড়িতে?

সে। না।

আমি। তবে? আচ্ছা, বিলেতে কি?

সে। কোথাও না। যাবার সময় বলে যাব, কে আমি। আগে থাকতেই অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। কি লিখছেন বলুন?

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মেয়েটি সুন্দরী। ফরসা নয়, তবু সুন্দরী। মুখশ্রী ভাষাময়, দৃষ্টিতে মাদকতা আছে। মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, একেই তো খুঁজছিলাম এতকাল্। শুধু মুগ্ধ নয়, প্রলুব্ধও করে। এত রাত্রে হঠাৎ আমার কাছে কেন?

সে। কি লিখছেন বলুন।

আমি। লিখছি আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী।

সে। আপনার জীবন ব্যর্থ! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না এ কথা।

আমি। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরই জীবন ব্যর্থ।

যাদের জীবন সার্থক, তারা ব্যতিক্রম। আমি ব্যতিক্রম নই, আমি সাধারণের দলে।

সে। হলেনই বা, জীবন ব্যর্থ হল কেন বুঝতে পারছি না। সামান্য পশুরও জীবন সার্থক, আর আপনার জীবন ব্যর্থ?

আমি। নিছক পশু হলে আমার জীবনও হয়তো সার্থক হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিছক পশুও নই, নিছক দেবতাও নই, উভয়ের সংমিশ্রণে হয়েছি মানুষ, তাই এই দুর্দশা।

সে। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি। দেবোচিত আদর্শ বজায় রেখে পশু-জীবন যাপন করবার সামর্থ্য নেই বলেই আমার জীবন ব্যর্থ।

সে। সামর্থ্য নেই? কেন? যুবক আপনি, শক্ত সমর্থ দেহ আপনার, শিক্ষা পেয়েছেন—

আমি। এর পরেই ঠিক কি করবেন বুঝতে পারছি।

সে। কি?

আমি। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে লম্বা একটা বক্তৃতা দেবেন। বেশ, দিন, ছাড়বেন না যখন। কেবল আশ্চর্য লাগছে, ঠিক এ সময়ে কি করে আপনি নাগাল পেলেন আমার!

সে। একালের ছেলেদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা শুনবেন?

আমি। বলুন।

সে। তারা খুব ভালো ছেলো। কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় 'আদর্শে যে সত্য মানে', কিন্তু—

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখ দুটিতে।

আমি। কিন্তু?

সে। কাজের বেলায় তারা অপদার্থ।

আমি। মেনে নিলাম। আর কিছু বলবার আছে আপনার?

সে। আপনি রাগ করছেন! উঠি তা হলে।

আমি। না না, বসুন। রাগ করা উচিত, কিন্তু চেষ্টা করেও রাগ করতে পারছি না বলে নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

সে। আজকালকার ছেলেরা আর কিছু না পারুক, বেশ বাগিয়ে কথা বলতে শিখেছে।

আমি। কেন অন্যায় কিছু বললাম কি?

সে। রাগ করা উচিত, অথচ রাগ করতে পারছেন না—এই নপুংসক মনোবৃত্তিই তো আপনাদের দুর্দশার কারণ। সত্যি যদি রাগ হয়ে থাকে, প্রকাশ করুন না সেটা।

দুজনেই চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা তার মুখে-চোখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

সে। আসল কথা কিন্তু আমি টের পেয়েছি—উঃ, কি ভণ্ড আপনি!

আমি। কি কথা?

সে। রাগ নয়, আপনার অনুরাগ হচ্ছে এবং সেটা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন। এত ভয় কেন ?

আমি। ভয় নয়, ভদ্রতা।

সে। ভদ্রতা মানেই ভীরুতা আর ভণ্ডামির মুখোশ।

আমি। সমাজে থাকতে গেলে ও মুখোশ পরতেই হবে।

সে। রাত-দুপুরে তেতলার এই নির্জন ঘরে সমাজ কোথায়?

আমি। রাত্রি কিন্তু প্রভাত হবে, তেতলার এই ঘরেও সারাজীবন বসে থাকা যাবে না।

সে। ও, তা হলে ওই পুরিয়াটার কোনো অর্থ নেই ?

আমি। কোন পুরিয়াটা ?

সে। যেটা আপনার প্যাডের তলায় চাপা রয়েছে।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

কে এ!

আমি। আপনি কে ?

সে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন রমণী। এর বেশি কোনো পরিচয় নেই আমার, থাকলেও তা অবান্তর।

আমি। আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে ?

সে। আমি জাদু জানি। দেখবেন ?

আলোটা নিবে গেল। অন্ধকারে বসে রইলাম দুজনে। তারপর ক্রমশ স্বচ্ছ হতে লাগল অন্ধকার। তারপর—

শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি, বাড়ির চারপাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা কচি কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা। একটু দূর দিয়ে নদী বয়ে গেছে একটা। দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে নদী, ওপারের বালুচর এবং তারও ওপারে দিগ্বলয়রেখা দেখা যায়। পূর্বদিকের দৃশ্যও মনোরম, সারি সারি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নির্মল আকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে টেনিস-খেলবার জায়গা, তকতকে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো, দু ধারে ঘন নীল রঙের পরদা ঝুলছে বল আটকাবার জন্যে। তার থেকে কিছু দূরে ঘাসের সবুজ "লন", রোলার চালিয়ে মালীটা ঘাস ছাঁটছে। গেটের সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচ-ঢালা পরিষ্কার রাস্তা শহরের দিকে। যে রাস্তাটা গেট থেকে বাড়ির দিকে এসেছে সেটা পিচ-দেওয়া নয়, সুরকির। চারদিকে সবুজ রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। গেটের ওপর ছোট একটি পিতলের ফলকে নাম লেখা রয়েছে—পি. এস. ডাট, আই. সি. এস.। পি. এস. ডাট—আমারই নাম, কিন্তু—

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড একটা হল। হলের একদিকে সোফা-সেটি। আর একদিকে শ্বেতপাথরের বড় গোল টেবিল একটা, তার চারদিকে

শৌখিন দামী কুশন-দেওয়া কয়েকটা বেতের চেয়ার, এক কোণে পিয়ানো একটা, হ্যাটর‍্যাক, দ্বারের দু পাশে সুদৃশ্য গোটা দুই গোল টেবিলের উপর পিতলের গোটা দুই বড় বড় সারস পাখি, চার দেয়ালে চারটে বড় বড় ছবি—একটা রাজা-রানীর, একটা দিল্লীর দরবারের, আর দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্য। এত জিনিস সত্ত্বেও প্রচুর জায়গা। হলের ভিতর কেউ নেই। কুচকুচে কালো বড় বড় লোমওয়ালা কানঝোলা একটা কুকুর এসে ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে, তার পিছু পিছু একজন খানসামা, খানসামার হাতে শিকল। খানসামাকে দেখে কুকুরটা ছুটে পালাল আর একটা দরজা দিয়ে। বিরক্ত হল না খানসামা, বরং তার মুখে ফুটে উঠল স্নেহকোমল একটা মৃদু হাসি, যেমন ফুটে ওঠে নিজের ছেলেকে দুষ্টুমি করতে দেখলে। বেরিয়ে গেল সে কুকুরের পিছনে পিছনে।

হলের আর একটা খোলা দরজা দিয়ে চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল, দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা। তারই এক ধারে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, টেবিলের সামনে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা পি. এস. ডাট, আই. সি. এস. বসে ফাইল ক্লিয়ার করছেন। আমিই। অদূরে বসে আছে মালতী একটা শৌখিন মোড়ায়, নীল রেশমের সুতো দিয়ে ফুল তুলছে বাসন্তী রঙের একটা রেশমী কাপড়ে। একটা কার্ড নিয়ে চাপরাসী প্রবেশ করল। পি. এস. ডাট বাঁ হাতের

তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে কার্ডখানাকে ধরে দেখলেন একবার, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল, তারপর বললেন, আচ্ছা, সেলাম দাও। প্রবেশ করলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্করবাবু। নমস্কার নয়, সেলামই করলেন—বেশ একটু ঝুঁকেই। ঢিলা-ঢালা গলাবন্ধ তসরের কোটের জন্য দেখা যাচ্ছে না তাঁর বিসদৃশ ভুঁড়িটা, কাঁচাপাকা চুল-ভরা বুকটাও দেখা যাচ্ছে না। খোলা গায়ে তাঁকে দেখলে অপরিচিত ছোট শিশুর ককিয়ে কেঁদে ওঠা অসম্ভব নয়। গৌরীশঙ্করবাবু চারটি বড় বড় মিলের মালিক, ধনবান লোক। বেশ কিছু খরচ করে সম্প্রতি চেয়ারম্যান হয়েছেন কংগ্রেসের টিকিটে। কিন্তু কোনও ছুতোয় হাকিমদের কাছে আসতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যান এবং হাকিমদের ঠিক অনুরোধ নয়, ইঙ্গিতমাত্র পেলেই এমন কাজ নেই যা করতে পারেন না, অবশ্য সে কাজ যদি অর্থসাধ্য হয়। বাইরে অবশ্য পরিষদমহলে বলে বেড়ান যে, হাকিমদের তোয়াক্কা করেন না তিনি। "ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের মুখের ওপর শুনিয়ে দিলাম কড়া কড়া কথা,—সেদিন কমিশনার সায়েব বললেন, এ কাজটি করে দিতে হবে ; আমি বললাম, মাপ কর সায়েব, কংগ্রেসের লোক আমি"—এই সব।

গৌরীশঙ্করবাবু প্রবেশ করতেই মালতী নিঃশব্দে উঠে গেল।

বসুন।

গদগদ মুখে বসলেন গৌরীশঙ্করবাবু। কিছুক্ষণ কোনো বাক্যই নিঃসৃত হল না তাঁর মুখ থেকে। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবই কথা কইলেন।

"আপনাদের মেথর-স্ট্রাইকের ঝামেলা মিটল ?"

"হ্যাঁ, মিটে গেল বইকি, হুজুর যখন পড়েছেন ওতে, তখন আর না মেটে, বড় পাজি ব্যাটারা, ছোটলোক কিনা।"

"ওদের মাইনে কিছু কিছু বাড়িয়ে দিন এবার, সত্যিই বেচারারা ইল-পেড—"

"নিশ্চয়। এবারকার বাজেটে প্রভিশন করতে হবে তার। কিন্তু কি করে যে করব, হুজুরের পরামর্শ নিতে হবে একদিন এসে আর কি—"

"বাজে খরচগুলো কমিয়ে নিন।"

"যে আজ্ঞে—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখের সামনে মেথরদের দুরবস্থার চিত্রটা ফুটে উঠল। তিনি স্বয়ং মেথর-পল্লীতে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। কি ভীষণ নোংরাভাবে থাকে ওরা! শুয়ার, মুর্গি, পচা ফ্যানের ডাবা, ময়লা কাপড় কাঁথা খাটিয়া, পাশেই পচা ডোবা একটা, রুক্ষমাথা এক পাল উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—সমস্ত চিত্রটা যেন আবার দেখতে পেলেন তিনি। আবার বললেন, ওদের ব্যবস্থাটা আগে করা দরকার।

যে আজ্ঞে। আমি কিন্তু এখন আর একটা দরকারে এসেছি হুজুরের কাছে।

কি, বলুন?

ফাউন্টেন পেনটা নামিয়ে রেখে যেন মন দিয়ে কথাটা শুনবেন, এমনই একটা ভঙ্গী করলেন পি. এস. ডাট। যদিও গৌরীশঙ্কর লোকটার উপর মনে মনে হাড়ে চটা তিনি এবং ইচ্ছে করলেই এঁকে 'ক্রাশ' করতেও পারেন, তবু এঁর কথা মন দিয়ে শুনবেন তিনি। ব্যক্তিগত আক্রোশ অনুসারে চলবার লোক তিনি নন। তিনি জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট, সকলের কথা শুনে সুবিচার করতে চান। করেনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে গৌরীশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন।

"যুগলের ব্যাপারে এসেছি—"

"যুগল কে?"

"আমার আপিসের হেড ক্লার্ক—"

"কি ব্যাপার কি?"

"তার এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে। ছটফটে ছোকরা, এসেই এক কাণ্ড করে বসেছে—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্কর ঢোঁক গিললেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল। মালতী কথা কইতে লাগল কার সঙ্গে ইংরেজীতে।

গৌরীশঙ্কর বলতে লাগলেন, "যুগলের একটা বন্দুক আছে, সাধারণ একনলা বন্দুক, ননকু—মানে যুগলবাবুর ভাইপো, বন্দুকটা নিয়ে বুঝি হনুমান তাড়াতে যায়, যতদূর শুনেছি, একটা হনুমানের দিকে ফায়ারই করেছিল বুঝি জানলা দিয়ে—"

"আমি সব জানি। এস. পি. ফোন করেছিল আমাকে। একজন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমাকে কি করতে বলেন ?"

গৌরীশঙ্করবাবু কিছু বললেন না, কেবল অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন পি. এস. ডাটের মুখের দিকে। এই অসহায় চাউনিটা তাঁর পোষা, যখন তখন ফুটিয়ে তুলতে পারেন চোখে এবং তা দেখলে যে কোনো ভদ্রলোক বিচলিত না হয়ে পারেন না। ব্যক্তিগত আক্রোশ সত্ত্বেও পি. এস. ডাট বিচলিত হলেন। সহজে বিচলিত হন বলেই পি. এস. ডাট এত জনপ্রিয়। বিচলিত হবার আর একটা গোপন কারণ অবশ্য ছিল। পি. এস. ডাটের আক্রোশ থাকলেও এই গৌরীশঙ্কর রায় কমিশনার সাহেবের প্রিয়পাত্র। তাঁর অনুরোধে প্রকাশ্যে গোপনে অনেক কিছু করে থাকেন তিনি টাকার জোরে। শহরের একজন নামী লোক, ধনী তো বটেনই।

"দেখুন, কেসটা সিরিয়াস—"

"একটা ব্যবস্থা করতেই হবে হুজুর—"

"বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা—যুগলবাবু এসে ধরেছেন আপনাকে—"

জিব কাটলেন গৌরীশঙ্করবাবু।

"যুগলের সাহসই হবে না, তা ছাড়া সে এখানে নেইও, সে থাকলে তার বন্দুকে হাত দিতে দেয় না কাউকে। আমি ছুটে এলুম তার বউটার কান্না দেখে, ছেলেমানুষ বউ, ঘন ঘন ফিট হচ্ছে তার, হুজুর গরিবের মা-বাপ, হুজুর যদি দয়া করেন এই ভেবে—"

শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে এল গৌরীশঙ্করের চোখ দুটি।

"আইনত যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু বে-আইনী কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি যদি খুন করি, ওই একই আইন দিয়ে বিচার হবে আমার।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিকই হুজুর।"—থেমে গেলেন গৌরীশঙ্করবাবু, ইতস্তত করলেন একটু, তারপর বললেন, "আচ্ছা, শুনছি, এখানে যে নতুন মেয়ে-হাসপাতালটা হচ্ছে তার টাকা কম পড়েছে কিছু। হুজুর যদি হুকুম করেন, তার ফাণ্ডে হাজার খানেক টাকা দিইয়ে দেব আমি যুগলের কাছ থেকে, হুজুর হুকুম করলে দিতে পথ পাবে না ও—"

"গরিব কেরানী, এক কথায় হাজার টাকা বার করতে পারবে?"

"না পারে, ওর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আমার হাতে আছে। তার থেকে লোন দিইয়ে দেব—"

"সেটা কি অত্যাচার করা হবে না তার ওপর ?"

"বেশ, আমিই নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেব না হয় ওর নাম করে।"

"দেখি—"

ফাইল একটা টেনে নিলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্করবাবু বুঝলেন, আর কথা কইবেন না সাহেব। উঠলেন।

"মনে রাখবেন হুজুর, গরিবের কথাটা। করুণা বলছিল কমিশনারের কাছে যেতে, কিন্তু আমি হুজুরকে চিনি—"

হেসে ঝুঁকে সেলাম করলেন, তারপরে বেরিয়ে গেলেন। ফাইলে মন দিলেন পি. এস. ডাট একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে। একটু পরে মালতী এল, হাতে তখনও সেলাই রয়েছে।

"তুমি এবার ওঠ, তোমার ভেজিটেবল স্ট্যু হয়ে গেছে—"

"নিজেই করলে নাকি ?"

"ইলেকট্রিক স্টোভে ক মিনিটই বা লাগল! এবার থেকে তোমার খাবারটা আমি নিজের হাতেই করব, বাবুর্চীর রান্না সহ্য হচ্ছে না তোমার—"

"একেবারে নিছক নিরামিষ স্ট্যু ?"

"মেজর প্যাসরিচকা তাই তো বলে গেলেন। অত ইউরিক অ্যাসিড বেরুচ্ছে যখন—"

"ফোন করছিল কে ?"

"মিসেস মরিসন। বিকেলে টেনিসে আসবে বলছিল, কিন্তু আমরা তো বিকেলে থাকব না।"

"কোথা যেতে হবে ?"

"বাঃ, স্কুলে প্রাইজ যে আজ, ভুলে বসে আছ, বেশ !"

"ও, তোমারই দেবার কথা, না ? ঠিক তো। কাপড়টার চমৎকার রঙ তো, কার জন্যে হচ্ছে ?"

"লিসির জন্যে করছি এটা—"

"লিসি কে আবার ?"

"পি. এ.র ভাগনী—"

"ও, সেদিন যে মেয়েটি এসেছিল ?"

চাপরাসী আবার প্রবেশ করল, হাতে এক বাক্স গ্রামোফোনের রেকর্ড।

"রেকাড় হুজুর—"

মালতী এগিয়ে গেল সাগ্রহে, বাক্সটা খুলে দেখতে লাগল।

"সত্যি বড্ড ব্যাকওয়ার্ড জায়গাটা। বুশ স্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট্ আর রেজিনাল্ড কেলের ব্রাম্‌স্ কুইন্টেট ইন বি মাইনারখানা থাকে যদি পাঠাতে লিখেছিলাম। এ কি অদ্ভুত রেকর্ড পাঠিয়েছে, সি স রাম্‌বা—ই নেহি লেগা, আপস দেও—"

"বহুত খুব হুজুর—"

বাক্স নিয়ে চলে গেল চাপরাসী। পি. এস. ডাট আফিসের কাজকর্ম নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন। অনেক ফাইল জমে গেছে

মালতী আবার গিয়ে বসল মোড়ায়। খানিকক্ষণ নীরবে সেলাই করবার পর বললে, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর আর এক জায়গায় যেতে হবে, এক জায়গায় কেন, দু জায়গায়। মানে, কালীবাড়িতে নারী-সমিতির একটা মীটিং হবে, সেখানেও যাব বলেছি। সেখান থেকে যাব ললিদের বাড়ি। ললির মেয়েটি কেমন হয়েছে দেখে আসব—ফ্রক করে রেখেছি তার জন্যে গোটা চারেক। এখানে অরগ্যাণ্ডি ভালো পাওয়া যায় না, জান—"

ডাট অন্যমনস্কভাবে বললেন, "তাই নাকি ?"

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মালতী আবার বললে, "সন্ধ্যেবেলা তোমার প্রোগ্রাম কি ?"

"আমাকে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর ক্লাব—"

"ক্লাবের সেক্রেটারিশিপ ছাড় তুমি। ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়ান নিয়ে ওসব ক্লিক ভালো লাগে না আমার।"

পি. এস. ডাট কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী মুখ টিপে হেসে তাঁর দিকে একটু চেয়ে আবার মন দিলে সেলাইয়ে।

হঠাৎ ডাট বললেন, "ব্রাউনকে যদি চায়ে নেমন্তন্ন করি আজ বিকেলে, অসুবিধে হবে কিছু ?"

"কিছুমাত্র না, অসুবিধে আবার কি! টম্যাটোর জেলি, ব্রাউনের যেটা ফেভারিট, প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক পাঁচটায়, মনে থাকে যেন। তার আগেই চা

শেষ করতে হবে। গল্প পেলে তোমরা তো সব ভুলে যাও! আর যত ঝঞ্ঝাট এসে জুটবে কি আমারই ঘাড়ে! কমিশনারের স্ত্রীকে বললেই পারত ওরা—”

ডাট স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন একবার মালতীর পানে, তারপর উঠে গেলেন এস. পি.কে ফোন করবার জন্যে। ফোনে খানিকক্ষণ কথা হল। উত্তেজিতভাবে রিসিভারটা নামিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাট।

“ব্রাউন আসতে পারবে না। মুরারিগঞ্জে হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা শুরু হয়েছে, আর্মড পুলিস নিয়ে এখুনি বেরোনো দরকার। আমাকেও যেতে হবে। কটা বেজেছে?”

রিস্ট-ওয়াচ দেখে মালতী বললে, “পৌনে এগারো। এখুনি বেরুতে হবে?”

“ইমিডিয়েট্‌লি—”

শঙ্কা ঘনিয়ে এল মালতীর চোখে।

“আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একা যেতে দেব না তোমায়—”

ডাট হাসলেন একটু।

“পথি নারী বিবর্জিতা—”

“আমি সে রকম নারী নই।”

“নারীর আবার রকমফের আছে নাকি?”

হঠাৎ বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ল ডাটের।

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে গেল মালতী, শোনা গেল, ফোনে

কথা কইছে। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বেশ খানিকক্ষণ কথা কয়ে বেরিয়ে এল।

"ব্রাউন চায়ে আসছে। প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের পর সে স্টার্ট করবে তোমাকে আমাকে নিয়ে।"

"কি রকম ?"

"তার আগে রেডি হতে পারবে না সে।"

একটু মুচকি হাসল মালতী।

"সে কি করে হয় ?"

আবার ফোন অভিমুখে অগ্রসর হতে চাইলেন ডাট।

"না, তুমি আর বাগড়া দিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাবই এবং প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরে তবে যাব।"—আদুরে আদুরে আবদারের সুরে বললে কথাগুলো। ডাট নিরস্ত হলেন। ফাইল নিয়ে বসলেন আবার। চাপরাসী এল, বললে যে, গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া বাইরে এসে বসে আছেন। ডাট মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, "লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোশালা করেছে, তোমাকে দিয়ে তার দ্বারোদ্ঘাটন করাতে চায়।"

"আমি ওসব পারব না।"

"লোকটা টাকার কুমির। একটু তোয়াজ করলে অনেক কাজ আদায় করা যেতে পারে।"

"বেশ তো, দিক না এখানকার মেয়েদের মাইনার স্কুলটাকে হাই স্কুল করে—"

"তা দেবার ক্ষমতা আছে ওর। সে উদ্দেশ্য যদি থাকে, তা হলে দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আপত্তি কোরো না।"

ঘণ্টা টিপলেন ডাট।

চাপরাসী এল।

"সেলাম দেও—"

প্রবেশ করলেন কালো লং-কোট গায়ে মাথায় হলদে পাগড়ি গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া।

অন্ধকার রাত্রি। কাঁচা মেঠো রাস্তা ভেঙে ছুটে চলেছে পি. এস. ডাটের মোটর মুরারিগঞ্জ অভিমুখে। এস. পি.র মোটর এগিয়ে গেছে। পিছনের সীটে বন্দুকধারী চাপরাসী বসে আছে। পি. এস. ডাট নিজেই মোটর চালাচ্ছেন, পাশে বসে আছে মালতী। হঠাৎ ভীষণ শব্দ হল একটা। টায়ার ফাটার শব্দ।

আই. সি. এস. হতে বিলেত গিয়েছিলাম কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। কিন্তু আমার স্বপ্নটা কি করে টের পেলে ও। এমনভাবে মূর্ত করলেই বা কি করে। আশ্চর্য।

৩

আলো জ্বলে উঠল।

সে আর আমি মুখোমুখি বসে আছি, তেতলার নির্জন ঘরে দ্বিপ্রহর রাত্রে।

সে। কেমন লাগল?

আমি। অদ্ভুত।

সে। পি. এস. ডাট আই. সি. এস. পরীক্ষা কেন দিতে পারলে না তা আমি জানি।

আমি। অনেকেই জানে, আপনার জানাও সম্ভব। কিন্তু আমার ধারণা, ঠিক কারণটা কেউ জানে না।

সে। দেখুন, প্রতি কথায় 'আমার ধারণা' 'আমার ধারণা' করাটা কেমন যেন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল আপনাদের! সবাই সবজান্তা!

আমি। আমি ইচ্ছে করেই সবজান্তা হবার চেষ্টা করে-ছিলাম, কারণ শুনেছিলাম, সবজান্তা না হলে আই. সি. এস. হওয়া যায় না।

সে। কিন্তু সবজান্তা হতে পারেন নি, হয়েছেন পল্লবগ্রাহী।

আমি। যা হয়েছি তা হয়েছি। বদলাবার উপায় নেই, ইচ্ছেও নেই আর। আই. সি. এস. পরীক্ষা না দেবার কি কারণটা শুনেছেন আপনি, জানতে পারি কি?

সে। নিশ্চয়ই পারেন। আমি কারও কাছে শুনি নি, নিজেই জানি।

আমি। কি বলুন তো ?

সে। অসুখটা আপনার ছুতো, মালতীর বাবার কাছে নিজের মান বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি। ঠিক পরীক্ষার আগেই আমার যে অসুখ হয়েছিল, সেটা তাহলে আমার মিছে কথা বলতে চান ? একজন এম. ডি., এফ. আর. সি. পি.র সার্টিফিকেট রয়েছে।

মুচকি হাসলে সে।

সে। মালতীর চিঠির মানে আপনি বোঝেন নি।

আমি। মালতীর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি ?

সে। না।

আমি। তা হলে এত কথা জানলেন কি করে ?

সে। বললাম তো, জাদু জানি।

আমি। সত্যি, অবাক হয়ে যাচ্ছি—

সে। পরিচয় পেলে দেখবেন, অবাক হবার কিছু নেই।

আমি। পরিচয় দিন।

সে। আপনার স্বভাব দেখছি অনেকটা আপনার বোন টুকুর মতো।

আমি। কি রকম ?

সে। কোনো একটা উপন্যাস আরম্ভ করে সে অধীর

হয়ে পড়ে, কিছুতেই তর সয় না, তাড়াতাড়ি আগেই শেষের কয়েক পাতা উলটে দেখে নেয়, নায়ক-নায়িকার কি হল।

আমি। কিন্তু এ উপন্যাসও নয়, আমরা নায়ক-নায়িকাও নই।

সে। গুছিয়ে লিখতে পারলে প্রত্যেক মানুষের জীবনই উপন্যাসে এবং ঠিক অবস্থায় পড়লে যে কোনো অপরিচিত যুবক-যুবতীই নায়ক-নায়িকায় রূপান্তরিত হতে পারে। নিদারুণ গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েও আপনি যে একটু রসস্থ হয়েছেন, তা তো টেরই পাচ্ছি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মেয়েটির মুখের দিকে। এ আমাকে এমন করে চিনলে কি করে।

আমি। আপনি আমার জীবনের সব কথা জানেন?

সে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। জ্ঞাতসারে আপনি নিজেও যা জানেন না, আমি তা-ও জানি। শুধু তাই নয়, ফুটিয়ে তুলতে পারি সে সব সিনেমা দেখানোর মতো করে আপনার মানসপটে, এখন যেমন তুললাম।

আমি। কে আপনি?

সে। আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে মিছে সময় নষ্ট করছেন কেন? এখন পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

হাসিমুখে চেয়ে রইল। আমিও চেয়ে রইলাম তার মুখের

পানে। দেখেছি, নিশ্চয় কোথাও দেখেছি একে। জাদু জানে নাকি সত্যি সত্যি ? এ কি অদ্ভুত ব্যাপার !

সে। মালতীর বাবাকে কিন্তু অমনভাবে ঠকানোটা ঠিক হয় নি আপনার।

আমি। আমি ইচ্ছে করে ঠকিয়েছি কি ?

সে। অনিচ্ছা সহকারে ঠকানোটাও ঠকানো। তিনি অত আশা করে অত খরচ করে আপনাকে বিলেত পাঠালেন আই. সি. এস. হবার জন্যে, আর আপনি স্বচ্ছন্দে পরীক্ষাটা দিলেন না!

আমি। দিতে পারা গেল না, কি করব ?

সে। দিতে পারলেও আপনি পাস করতেন কি না সন্দেহ। আপনার অসুখ হয়ে, মানে মালতীর চিঠিটা পেয়ে, আপনি যেন বেঁচে গেলেন।

আমি। পরীক্ষা দিলেও পাস করতে পারতাম কি না এ বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন কি করে।

সে। সেখানে মদ খেয়ে, মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে, ক্লাবে ক্যাবারেতে নেচে নাচ দেখে, ভারতবর্ষের হিতার্থে সভাসমিতির ভড়ং করে, সে দেশের হাব-ভাব শিখে যতটা সময় ব্যয় করেছিলেন, তার শতাংশের একাংশও কি পড়াশোনার জন্যে করেছিলেন ? আপনি তো বই ছুঁতেন না।

আমি। শিক্ষালাভ মানে কি শুধু পুঁথি মুখস্থ করা ?

সে। তা না হতে পারে। কিন্তু আপনি মালতীর বাবার

টাকা নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন একটা বিশেষ পরীক্ষায় পাস করবার জন্যেই। জামাইয়ের যাতে একটা ভালো চাকরি হয়, এই আশাতেই ভদ্রলোক অতগুলো টাকা খরচ করেছিলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে, আপনার মনের সংস্কার-সাধন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আমি। জুয়ো খেলতে বসলে হারজিত দুইই হবার সম্ভাবনা। মালতীর বাবা হেরে গেছেন, আমি কি করব, বলুন ?

আবার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

সে। ওই কথা আউড়ে নিজের বিবেকের কাছে রেহাই পেতে চাইছেন বুঝতে পারছি—সত্যি, কি অদ্ভুত লোক আপনারা।

কথাটার মোড় কোন দিকে ঘুরবে তা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সেও চুপ করে গেল। খানিক-ক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মনে হল, ঠিক এই রকম একখানা মুখ যেন প্যারিসে থাকতে দেখেছিলাম। মনে হল, যেন Elysee's-এর একটা কাফেতে বসে আছি, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছি শ্যাম্পেনের গ্লাসে, চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোত—জীবন্ত নরনারীর স্রোত, ফেনিল আবর্ত তুলে, নানা রঙে নানা ভঙ্গিতে। স্রোতে নানা তরঙ্গ উঠছে, চটুল দৃষ্টির, মিষ্টি কথার, কলহাস্যের। পলকে প্রলয় ঘটছে। সেই ভিড়ে কি চকিতের জন্য দেখেছিলাম একে ? না লণ্ডনে ?

গ্রাভনার স্ট্রীটের আলোক-বাদ্য-পানীয়-নর-নারী-সমন্বিত ফ্যাশানদুরস্ত হোটেলের ছবি ফুটে উঠল একটা মনে। কিউ-টেক্সনখী, শ্বেত-দন্তী, রঞ্জিতাধরা, নব-ভীট-মর্দিনীর দল, যাদের শুধু দেহে নয় মনেও অতি-আধুনিক আর্ট-বিজ্ঞানের ছাপ মারা, যারা খ্যাতির উপাসিকা, কুবেরের সহচরী, সাময়িক পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় যাদের, সিনেমা স্টার হয়ে শেষ পর্যন্ত মোক্ষলাভ করে যারা, এ কি তাদেরই একজন? নিগ্রো-অধ্যুষিত কোনো নাইট ক্লাবের গোপন-বিহারিণী? যেই হোক, আমার এত কথা জানলে কি করে?

হঠাৎ সে কথা বললে আবার।

সে। সত্যিই অদ্ভুত আপনারা!

আমি। অদ্ভুত মানে?

সে। গোঁড়া হিন্দু বাবার আশ্রয় থেকে যখন সরে পড়লেন, তখন বিবেককে স্তোক দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলাটাই যথার্থ পৌরুষ, জাতিভেদ তুলে দিয়ে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে সমুদ্র-যাত্রা করে অন্য জাতের মালতীকে বিয়ে করাটাই যথার্থ সৎকর্ম, এখন কিন্তু আবার বলছেন যে, মালতীর বাবা জুয়া খেলতে গিয়ে হেরে গেছেন, আমি কি করব!

আমি। দুটোই সত্যি।

সে। সবচেয়ে বেশি সত্যি কি জানেন?

আমি। কি?

সে। আপনার খামখেয়ালী অসংযত স্বভাবটা। যদি আপনার বাবার মতো শক্ত সমর্থ পুরুষ হতেন, তা হলে হয়তো—

আমি। বাবাকেও চেনেন দেখছি।

সে। শুধু চিনি না, শ্রদ্ধা করি।

আমি। শ্রদ্ধা করেন? এ যুগে ওরকম জাত-মানা, পাঁজি-মানা, গোঁড়া, একগুঁয়ে লোককে শ্রদ্ধা করা যায়?

সে। শক্তিশালীকে সব যুগেই শ্রদ্ধা করা যায়। তাঁরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পারেন আপনি অমন?

আমি। কি?

সে। একটানা দুদিন নিরম্বু উপবাসী থাকতে, সেবার যেমন তিনি ছিলেন জয়পুর যাবার সময়?

আমি। ট্রেনে জলস্পর্শ করব না, কারও ছোঁয়া কিছু খাব না—এসব আজকালকার যুগে অচল।

সে। আপনার কাছে অচল, কিন্তু তিনি তো ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা তো কই তাঁকে বয়কট করতে পারেন নি! তিনিই বরং আপনাদের বলছেন, সরে থাক আমার কাছ থেকে তোমরা।

আমি। ওইটেই ঠিক পথ?

সে। সেটা তর্কসাপেক্ষ। আমি সে তর্ক তুলতেও চাই না, কারণ, তুললেই আপনি পরের ধার-করা কতকগুলি বুলি আউড়ে

যাবেন। আমি শুধু বলছি, তিনি তাঁর নিজের নির্দিষ্ট পথ থেকে এক চুলও নড়েন নি, কিন্তু আপনি বার বার পথ বদলাচ্ছেন।

আমি। কারণ আমি কোনো শিকলে বাঁধা থাকতে চাই না, আমি স্বাধীন।

সে। এক কথায় উচ্ছৃঙ্খল—

আমি। হয়তো।

হঠাৎ অনুভব করলাম, ক্রমশ কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, ক্রমশ একটা নেশা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমাকে।

সে। একটা কথার জবাব দেবেন ?

আমি। বলুন।

সে। প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস আছে আপনার ?

আমি। না।

সে। তা হলে বিলেত থেকে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন কেন ?

আমি। মায়ের কাতর অনুরোধে।

সে। কিন্তু বিলেত যাবার আগে মালতীদের সঙ্গে মেশা-মিশি করতে বারণ করেও তো মা কাতর অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন বার বার। তখন সে অনুরোধ শোনেন নি কেন ?

আমি। মালতীকে এত ভালো লেগেছিল যে, মায়ের অনুরোধ রাখতে পারি নি।

সে। অথচ এখন তারই ওপর এত বিতৃষ্ণা। আচ্ছা, সত্যিই কি বিতৃষ্ণা ?

আমি। আপনি যখন সব কথাই জানেন, তখন—

সে। জানি বইকি। মালতীর চেয়ে বেশি জানি। আপনার বিলেতের অসুখের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা মালতী জানে না, আমি জানি।

মুচকি হাসলে।

আমি। একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে আমার।

সে। কি ?

আমি। কি করে জানি না, আপনি আমার চরিত্রের খারাপ দিকটার সব খবর টের পেয়েছেন আর তাই নিয়েই আলোচনা করছেন খালি। আপনাকে ছদ্মবেশিনী মিস মেয়ো বলে সন্দেহ হচ্ছে এবং তাতে আরও খারাপ লাগছে।

সে। বিলেতে আপনার অসুখের ইতিহাসটা আপনার চরিত্রের খারাপ দিক নয়।

আমি। ওটা আমার দুর্বলতার ইতিহাস, মোটেই গৌরবজনক নয়।

সে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নেমেছিলেন, তখন সেটাকেও অনেকে দুর্বলতা আখ্যা দিয়েছিল, বলেছিল, নাটকীয় একটা কিছু করবার লোভ সামলাতে পারেন নি তিনি।

আমি। ছি ছি, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা দিচ্ছেন!

সে। আয়তনে এবং উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হলেও খানিকটা মিল আছে বইকি।

আমি। কিছু মিল নেই।

সে। সত্যি? কিন্তু আমি যতদূর জানি—

আমি। আপনি জানেন না। নারী-প্রেম আর দেশ-প্রেম এক জিনিস হতে পারে না।

সে। এক জিনিস তো আমি বলছি না। আমি বলছি, এক জাতের জিনিস। নয়?

ফিক করে হাসলে একটু আবার।

আমি। আপনার হাসিটি কিন্তু শানিত তীরের মতো বিঁধল। ঠাট্টা করছেন? জীবনে নানাভাবে বিপথে গেছি তা ঠিক, কিন্তু এককালে আমার প্রাণেও স্বদেশপ্রেম ছিল। বিশ্বাস হয়তো করবেন না। যখন আমার সতের-আঠার বছর বয়স, তখন—

সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখ দুটি। অদ্ভুত দীপ্তি! মনে হল যেন—

হঠাৎ আলোটা নিবে গেল আবার।

৪

অন্ধকার। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে ঘন মেঘ, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গুরুগুরু ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই দুর্যোগ মাথায় করেও কিন্তু এগিয়ে চলেছে ব্রিটিশবাহিনী ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশী অভিমুখে। নিঃশব্দে ভাগীরথী পার হল তারা, তারপর শুরু হল মার্চ—ডবল মার্চ। বৃষ্টি পড়ছে পড়ুক, বজ্রাঘাত হয় হোক, রাতারাতি পৌঁছতেই হবে পলাশীতে। মীরজাফর খবর পাঠিয়েছে। রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ সকলেই আশ্বাস দিয়েছেন, সৈন্যদলে কালা আদমিরও অপ্রতুল হয় নি। মীরজাফরের নির্দেশমতো ঠিক সময়ে পলাশীতে পৌঁছতে পারলে যুদ্ধ জয় হবেই। নবাবের সেনা আগে থাকতে এসে পলাশী যেন না অধিকার করে—দ্রুতবেগে মার্চ করে চলল সৈন্যদল পলাশীর আম্রকানন লক্ষবাগ লক্ষ্য করে, পৌঁছতে হবে যেমন করেই হোক রাত্রের মধ্যে। মাত্র সাড়ে সাত ক্রোশ পথ, কতক্ষণ আর লাগবে! এগিয়ে চলল ব্রিটিশ-বাহিনী দুর্যোগ মাথায় করে।

•

দৃশ্য বদলাল।

ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের মতো বেঁকে গেছে ঠিক তার পূর্বদিকে সিরাজের শিবির। আষাঢ় মাসের গভীর রাত্রি,

চিন্তামগ্ন নবাব বসে আছেন একা, সম্মুখে কারুকার্যখচিত বহুমূল্য ফরসি, সুগন্ধি তামাকের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। এক কোণে স্বর্ণ-শামাদানে সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলছে, স্তিমিতালোক। ঘন সবুজ মখমলের গালিচাটা মনে হচ্ছে কালো রঙের। থমথম করছে পলাশীর বাতাস, আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ চিরে চিরে ফেলছে নক্ষত্রহীন মেঘাবৃত আকাশকে। সহসা বজ্রপাত হল, হু-হু করে একটা আর্দ্র বাতাস ঢুকল শিবিরের বাতায়নপথে। সিরাজ উঠে দাঁড়ালেন, পদচারণ করতে লাগলেন অস্থিরভাবে। স্তিমিতালোকে তাঁর কালো ছায়াটাও ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে। দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে উঁকি দিল কে একজন, একবার নবাবের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর ফরসিটার দিকে। চিন্তামগ্ন নবাব দেখতে পেলেন না কিছু। শিবিরগাত্রবিলম্বিত পর্দার ছায়ায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল লোকটা, নবাবের দিকে চাইলে আর একবার, তারপর টপ করে ফরসিটা নিয়ে চুপিচুপি সরে পড়ল অন্ধকারে। চোর! সহসা নবাবের নজরে পড়ল, ফরসি নেই।

কোই হ্যায় ?

কেউ এল না, কেউ সাড়া দিল না।

আবার দৃশ্য বদলাল।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ইংরেজ-সৈন্য আমবাগানের অন্তরালে, নবাব-সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে। নবাবের সনির্বন্ধ অনুরোধে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ সৈন্যপরিচালনা করেছেন, অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, উদ্দেশ্য আমবাগানকে দু দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা। মধ্যস্থলে আক্রমণ করবেন মীরমদন, তাঁর এক পাশে ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁ, আর এক পাশে বাঙালী বীর মোহনলাল। সবিস্ময়ে দেখলাম, আমিই মোহনলাল। অদূরে একটা সরোবর, তার তীরে সারি সারি কামান সাজিয়েছেন মীরমদন। সহসা সংবাদ রটে গেল, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ, এঁরা কেউ অগ্রসর হলেন না, সসৈন্য দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতবৎ। সৈন্যদলে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা। গুম গুম গুম গুম—গর্জন করে উঠল মীরমদনের কামান। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সার বেঁধে এগুতে লাগল বিরাটকায় সজ্জিত হাতির দল বাজনার তালে তালে পা ফেলে শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে, দ্রুতবেগে ছুটে চলল অশ্বারোহিগণ, ঘড়ঘড় করে এগিয়ে গেল কামানের সারি উঁচু উঁচু চাকার উপর। গুম গুম গুম—ইংরেজরাও প্রত্যুত্তর দিলেন আম-বাগানের ভিতর থেকে। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ হতে লাগল, মুহুর্মুহু বাড়তে লাগল হতাহতের সংখ্যা দু পক্ষেই। আরও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন মীরমদন, মোহনলালের শিরা-উপশিরায় নাচতে লাগল শোণিতধারা। সমস্ত দিন যুদ্ধ হল—

ভীষণ যুদ্ধ। অবশেষে আমগাছের আড়ালে আড়ালে আত্ম-গোপন করে বসে পড়ল ক্লাইভের সৈন্যরা, উঁচু চাকায় বসানো নবাবের কামান বৃথাই গর্জন করতে লাগল, একটি গোলাও স্পর্শ করল না বিপক্ষদলকে। তাদের কামান কিন্তু চলতে লাগল সমানে—হঠাৎ একটা গোলা এসে লাগল মীরমদনের উরুদেশে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, দেখতে দেখতে পাণ্ডুর হয়ে এল তাঁর মুখচ্ছবি, ধরাধরি করে নিয়ে গেল তাঁকে শিবিরের মধ্যে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ইয়ারলতিফ দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলেন, এক পা-ও এগুলেন না। মীরমদনের পতনে ভীত হয়ে পড়ল নবাব-সেনা। নবাব হুকুম দিলেন, যুদ্ধ স্থগিত রাখ এখন। যুদ্ধ স্থগিত রাখ! সেনা ছত্রভঙ্গ হয়-হয়, গর্জন করে উঠলেন বাঙালী বীর মোহনলাল, সিরাজের প্রিয়পাত্র ভক্ত মোহনলাল—'দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে যবন, দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ—' আকাশ প্রকম্পিত করে বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। পরস্পরবিরোধী অক্ষয় মৈত্র ও নবীন সেন সমস্ত বিরোধিতা ভুলে গলাগলি করে এসে দাঁড়ালেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আমার মানসক্ষেত্রে!

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে। অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চকমক করছে চোখ দুটিতে।

সে। একটা কথা জানেন?

আমি। কি বলুন?

সে। হিন্দু মোহনলাল মুসলমান সিরাজের এত প্রিয়পাত্র হয়েছিল কি করে?

আমি। সিরাজ ছিলেন গুণগ্রাহী।

সে। না, মোহনলালের ভগ্নী ছিলেন রূপসী। সিরাজের কামনা-বহ্নিতে ভগ্নী-আহুতি দিতে হয়েছিল মোহনলালকে।

হঠাৎ আলো নিবে গেল। মনের আলোটাও। নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে বিহ্বল হয়ে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আর একটি ছবি।

ছোট একখানি ঘর। ঘরের একপাশে ছোট একটি চৌকি। চৌকিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছি আমি, সতেরো-আঠারো বছর বয়সের আমি, একটু একটু গোঁফ-দাড়ি উঠেছে, মসৃণ ললাট, চিবুকে অধরে অর্ধজাগরিত পৌরুষের আভাস, চোখে আদর্শের স্বপ্ন। মাথার শিয়রে ছোট কাঠের টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্‌ফ, তার একধারে ছোট টাইমপিস একটা। ঝনঝন করে অ্যালার্ম বেজে উঠল। উঠে বসলাম। বন্ধ করে দিলাম অ্যালার্মটা। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে এসে ডন-বৈঠক করলাম খানিকক্ষণ, স্নান করে এলাম চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কনকনে জলে। স্নানান্তে মেরুদণ্ড ঋজু করে চৌকিরই উপর বসে প্রাণায়াম করলাম কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বেলে পড়তে বসলাম গীতা। গীতা পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত হল সর্বশরীর—মনে হতে লাগল, আমিই যেন অর্জুন, চোখের সামনে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছি—বহু মুখ, বহু চোখ, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর, দংষ্ট্রাকরাল মুখগহ্বর, চোখে সূর্য-চন্দ্র জ্বলছে, সর্বাঙ্গে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত অপ্রমেয় বিরাট পুরুষ অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। ভীত বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমিই যেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।

পড়ছি মনে হল না, মনে হল, সত্যিই যেন শুনছি—

"আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, এখন আমার সংহারমূর্তি, তুমি যুদ্ধ না করিলেও কেহ রক্ষা পাইবে না। অতএব যুদ্ধ কর—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রু ভুঙ্ক্ষ রাজ্য সমৃদ্ধং।"

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড প্রান্তর। জ্যোৎস্না উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে সরকারী খাজনার গাড়ি লুট হয়ে গেছে, অপহৃত ধনসম্ভারের ব্যবস্থা করবার জন্যে চলে গেছে জীবানন্দ একটু আগেই অনুচরবর্গ সমেত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নির্জন মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি। ভবানন্দ নয়, আমি। গান ধরেছি গলা ছেড়ে মল্লার রাগিণীতে—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

পিছনে আসছে মহেন্দ্র সিং নয় বন্ধু যতীন। গানের ফাঁকে ফাঁকে সহসা যেন শুনতে পেলাম বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর —মহাকাশ থেকে ভেসে আসছে মহাকালকে এড়িয়ে। সত্যিই মনে হচ্ছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' যতীনের

মুখে শুনছি বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর—"জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল এই সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি—"

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ঝলমলে-জরি-দেওয়া একটা লাল পাড়ের ঝলকানিতে সমস্ত মিলিয়ে গেল নিমেষে। চোখের সামনে ভেসে উঠল—আধখোলা জানলায় এক ফালি রোদ এসে পড়েছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বেণী রচনা করছে টগর, কাঁধের উপর বুকের উপর জ্বলজ্বল করছে জরি টকটকে লাল পাড়ের কোলে, সরু মেয়েলী গলায় কে যেন গান গাইছে ছায়ানটে—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না, যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না—'। আমি নির্নিমেষে চেয়ে আছি, উৎকর্ণ হয়ে শুনছি···গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ, টগর, যতীন···

দৃশ্য বদলাল।

নির্জন পার্ক। আমি আর যতীন পাশাপাশি বসে আছি। দুজনেরই পকেটে রিভলবার—তিনটে রিভলভার। মালদা থেকে যে ছেলেটির আসবার কথা আছে আজ রাত্রে এখানে, তাকে দিতে হবে একটা। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে বসে আছি আমরা, প্রত্যেক গেটে নজর রাখছি, বিশেষ করে উত্তর দিকের গেটটায়। সাহেবী পোশাক পরে চকোলেট রঙের ফেল্‌ট্ ক্যাপ

মাথায় দিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ওই গেট দিয়েই তার ঢোক-বার কথা। দুজনেই নিঃশব্দে বসে আছি। যতীনের মনে কি জাগছিল জানি না, কিন্তু আমি ভাবছিলাম দেশের বাগদী আর সাঁওতালদের দলে টানবার কথা। ভাবছিলাম শিবাজী আর রাণা প্রতাপ সিংহের কথা। পার্বত্য মাওয়ালী আর ভীলদের সুশিক্ষিত করেছিলেন তাঁরা, আমরাই বা—হঠাৎ উত্তর দিকের গেটটা দিয়ে ঢুকলেন একজন মহিলা। এসে বসলেন ঠিক আলোর নীচেই যে বেঞ্চিটা ছিল তার উপরে। যতীন আমার গা টিপলে। চুপচাপ করে কাটল আরও কয়েক মিনিট। মহিলা চুপ করে বসে রইলেন, মনে হল, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছেন। সহসা পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে রঙচঙে লুঙ্গিপরা চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে দুটি লোক ঢুকল। একজনের হাতে বেলফুলের মালা, আর একজনের বগলে একটা কালো বোতল, খুব সম্ভব মদই আছে তাতে। মশমশ করে এগিয়ে এল কিছুদূর, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে মহিলাটিকে। দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে, চোখে চোখে কি একটা ইশারা হয়ে গেল যেন, চুপি চুপি কথা হল, হাসিরও আওয়াজ পাওয়া গেল একটু। তারপর দুজনেই মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল, সোজা গিয়ে তাঁর সামনাসামনি দাঁড়াল। কি কথা হল শুনতে পেলাম না, কেবল দেখা গেল, মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। ক্রমশ বচসা শুরু হল, মহিলা রোষভরে চলে যেতে উদ্যত

হলেন, লোক দুটো হাত বাড়িয়ে পথরোধ করলে, এমন কি একজন হাত ধরে আকর্ষণও করলে, মহিলা চিৎকার করে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, অসহায়ভাবে চাইতে লাগলেন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল যতীন। চুপি-চুপি বললে, তুই বসে থাক, আমি দেখি ব্যাটাদের। চলে গেল, নিমেষে গিয়ে হাজির হল সেখানে। যতীনকে দেখবামাত্র লোক দুটো যেন ভয় পেয়ে পালাল মনে হল। মহিলা মূর্ছা গেলেন। যতীন দু হাত দিয়ে না ধরলে দড়াম করে পড়ে যেতেন মাটিতে। মূর্ছিতা মহিলাকে সামলাতে যতীনের দু হাত যখন ব্যস্ত, তখন আচম্বিতে লোক দুটো ছুটে এসে পিছন দিক থেকে জাপটে ধরলে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হুইশলের তীব্র ধ্বনি শোনা গেল, সহসা পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল লাল-পাগড়ি পুলিশ—যতীন ধরা পড়ল। সমস্তটাই পুলিশের সাজানো ব্যাপার, মহিলাটি ভাড়া-করা। যতীনের নামে হুলিয়া ছিল। যতীন যে সর্বদা রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, তা পুলিশের অবিদিত ছিল না। আজ রাত্রে পার্কে আসবার কথাও পুলিশ টের পেয়েছিল আগে থাকতে। পুলিশের আশঙ্কা ছিল, সামনাসামনি ধরতে গেলে বিনাযুদ্ধে যতীন আত্মসমর্পণ করবে না—তাই এই ফাঁদ।

হাতকড়ি পরিয়ে দিলে। চড়াত করে একটা শব্দ হল। চাপদাড়িওয়ালা একটা পুলিশ চড় মারলে যতীনের গালে।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, সে আমার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রয়েছে, চোখে আগুন জ্বলছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, নিদারুণ একটা ঘৃণায় সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার।

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। ভয় পেয়ে।

অপরূপ একটা মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখখানা।

সে। কিসের ভয়ে? পুলিশের? তবে তার পরদিন পুলিশের কাছে গিয়ে ধরা দিলেন কেন অকপটে সব কথা স্বীকার করে? ভাগ্যে পুলিশ-অফিসারটি আপনার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, তাই রক্ষে পেয়ে গেলেন, তা না হলে তো—

আমি। আপনি কে?

সে। ও কথা থাক, তাতে লাভ কি হয়েছিল জানেন?

আমি। শুনেছি, যতীনের—

সে। হ্যাঁ। যতীনের কেস আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আমি। আপনি স্পাই নাকি?

সে। এতক্ষণে যা হোক ঠিক ধরতে পেরেছেন।

আমি। সত্যি স্পাই ?

সে। সত্যি।

চাপা হাসি চিকমিক করতে লাগল চোখে।

আমি। কে আপনি, বলুন—

সে। বিলেতে এত মেয়ে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, অথচ আমার মতো সামান্য একটা মেয়েকে দেখে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

আমি। রাত-দুপুরে এই তেতালার ঘরে আপনার আবির্ভাবটা সত্যিই একটু উত্তেজনাজনক—তা ছাড়া আপনি—

সে। আমি শুধু নয় আরও অনেক এসেছে হয়তো।

আমি। তার মানে ?

সে। আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে আসবার সময় সম্ভবত এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে—

মুচকি হাসি ফুটে উঠল অধরে তার।

আমি। যে ?

সে। যে, বাইরে থেকে তেতলায় ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথা মনে ছিল না আপনার।

আমি। সেই দরজা দিয়ে এসেছেন ? বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু আপনি কে ?

সে। নামটা শুনতে চান ?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি, আমার নাম অনীতা।

আমি। অনীতা?

সে। নামটা পছন্দ হচ্ছে না? ওই ধরনের নামেরই তো আজকাল চলন হয়েছে। ঝড়ঝড়ে মোটরবাসের নাম যদি মেনকা হয়, তা হলে—

আমি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন আপনার নাম কি?

সে। যদি বলি যজ্ঞেশ্বরী, তা হলে কি পিত্তি চটে যাবে আপনার?

ঠোঁটে হাসি নেই, চোখ দুটি হাসছে।

আমি। আমার মনের যা অবস্থা, তাতে রসিকতা ভালো লাগছে না এখন। সত্যি বলুন।

সে। সত্যি কথা বলায় বিপদ—লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি। বিশ্বাসযোগ্য হলে কেন তা বিশ্বাস করবে না?

সে। বিশ্বাসযোগ্য হলেও তা বলা নিরাপদ নয়।

আমি। আপনার সত্য পরিচয় কি অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে?

সে। আমি এমনভাবে কখনও নিজেকে প্রকাশ করি নি, সুতরাং আমার পরিচয় প্রিয় হবে কি অপ্রিয় হবে তা জানি না। পরিচয়ের প্রয়োজনটাই বা কি বুঝতে পারছি না। অপরিচয়ের অন্তরালটাই তো রোমান্টিক!

আমি। সব সময়ে নয়।

সে। ধরুন, যদি বলি, আমি আপনার দূরসম্পর্কের পিসী!

আমি। পিসী!

সে। হতে বাধা কি?

চোখের দৃষ্টিতে আবার ছড়িয়ে পড়ল হাসির আভা।

আমি। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে!

সে। এ যুগে কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হওয়াটাই কি আশ্চর্যজনক নয়? এ যুগে আকাশ থেকে সৈন্যবর্ষণ হয়, সমুদ্রের তলায় টর্পেডো ছোটে, রেডিওতে বাণী বহন করে, টেলিভিশনে দেখাসাক্ষাৎ হয়, থিওরি অব রেলেটিভিটি পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট করে। এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন! ওগুলোর যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, এটারও আছে।

আমি। কিন্তু—

সে। না তর্ক থাক, ওগুলোকে যেমন মেনে নিয়েছেন, আমাকেও তেমনই মেনে নিন। কথায় কথায় আসল কথাটা চাপা পড়ে গেছে।

আমি। কেন?

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। বললাম তো, ভয়ে।

সে। পুলিশের ভয়ে, না প্রথম প্রণয়িনী টগরের বিচ্ছেদের

ভয়ে ? ঝলমলে জরিদার লাল পাড়ের ঝলকানির মোহটাই কি আসল কারণ নয় ?

আমি। পুলিশের ভয় একটু ছিল বই কি। স্বীকার করলাম না হয় মোহটাই আসল কারণ, কিন্তু মোহ সত্ত্বেও আমি পরদিন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলেছিলাম, এটার আপনি একটুও মূল্য দেবেন না ?

সে। গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার কোনো মূল্য নেই তো সত্যি !

আমি। যতীনের মতো ধরা পড়তে পারি, এ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। এর কোনো মূল্য নেই ?

সে। থাকত যদি আপনি বাঙালী এবং পিতৃবন্ধু পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে না গিয়ে সাহেব পুলিশ কমিশনারের কাছে যেতেন।

আমি। তার মানে ?

সে। তার মানে সত্যি সত্যি যদি বিপদকে বরণ করতেন। আপনি যা করেছেন, তাতে সাপ মরেছে কিন্তু লাঠি ভাঙে নি।

আমি। বুঝতে পারছি না ঠিক। আমি যার কাছে গিয়েছিলাম, তিনিও খুব কড়া লোক। সবাই তাঁকে বাঘ বলে।

সে। ভাত-খেকো বাঙালী বাঘ। চাকরি বাঁচিয়ে সুযোগ-মতো বন্ধুর ছেলেকে বাঁচাতে পারলে বাঁচাতে ইতস্তত করেন না। করেনও নি।

আমি। আপনি কি বলতে চান, আমি এত কথা ভেবে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ?

সে। জ্ঞাতসারে না ভাবলেও অজ্ঞাতসারে হয়তো ভেবেছিলেন।

আমি। ছি ছি, এত হীন ভাবেন আপনি আমাকে !

সে। হীন-অহীনের প্রশ্নই ওঠে না এতে। কিন্তু বুদ্বুদকে পর্বত মনে করি কি করে, বলুন ? বুদ্বুদ অথবা পর্বত কেউ হীন নয়।

আমি। দেখুন, রবি ঠাকুরের যুগে উপমার ফেরে পড়ে আমরা অনেক সময় আসল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছি। দোহাই আপনার, উপমা দেবেন না, একটা প্রশ্নের সহজ উত্তর দিন যদি পারেন। ব্যাপারটা আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি আজও।

সে। কি বলুন ?

আমি। সেদিন আমি পুলিশের কাছে গেলাম কেন টগরকে ভালোবাসা সত্ত্বেও ? বিশ্বাস করুন আমি কল্পনাও করি নি যে, তিনি আমায় বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তখন জানতামও না যে, বাবার কাছে তিনি টাকা ধার নিয়েছেন। আমি ধরা দিতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন ? আমার প্রথম প্রণয়ের আকর্ষণটা কিছু কম প্রবল ছিল না, নবোদ্ভিন্নযৌবনা টগর বাহুপাশে ধরা দেব-দেবও করছিল, তবু আমি কারাবরণ করতে ছুটলাম কেন ?

সে। দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, টগরের চক্ষে

নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার জন্যে, যদিও তা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর সামিল, আর দ্বিতীয়, হয়তো মানুষের বিবেক পশুর বিবেককে পরাভূত করেছিল ক্ষণিকের জন্য এবং তারই উত্তেজনায় হয়তো আপনি ছুটে গিয়েছিলেন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঙালীসুলভ উচ্ছ্বাসবশত। সত্যি সত্যি ধরা পড়লে হয়তো দ্বীপান্তরে বসে অনুতাপ করতেন এর জন্য আজীবন।

আমি। অনুতাপ করতাম! ঠিক জানেন আপনি?

হঠাৎ আলো নিবে গেল।

তালুকপুরের স্কুলের থার্ড মাস্টারের শয়নকক্ষ। থার্ড মাস্টার অবিবাহিত যুবক। গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন একা। ঠিক জানলার নীচেই বেলফুলের ঝাড়ে অজস্র বেলফুল ফুটেছে, খোলা জানলা দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশ দেখা যাচ্ছে খানিকটা, ধনুরাশির ঠিক নীচেই করোনা বোরিয়ালিস খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছায়াপথের খানিকটা দেখাচ্ছে ঠিক এক টুকরো ধবধবে সাদা মেঘের মতো। অন্যদিন হলে এমন পরিষ্কার আকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠত থার্ড মাস্টার। হয়তো ম্যাপ খুলে সমস্ত রাত্রি জেগে বসে থাকত ছাতে কুম্ভরাশির শতভিষা নক্ষত্র দেখার জন্য। আজ কিন্তু তার ওসব কিছুতে মন নেই। আজ তার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে একটি কথাই চিন্তা করছে— বাতাসী অন্তঃসত্ত্বা, জানাজানি হয়ে গেছে। গ্রামের বেওয়ারিশ মেয়ে বাতাসী, অন্তত এতকাল বেওয়ারিশ ছিল, সবার বাড়িতে ঝি-গিরি করে বেড়াত। থার্ড মাস্টারের বাসা-বাড়িতেও। কানাঘুষো চলছিল অনেক দিন থেকে, আজ কিন্তু আর সন্দেহ নেই, সত্যিই সে সন্তানসম্ভবা। শুধু তাই নয়, তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী হাজির হয়েছে হঠাৎ এসে। দশ বছরের বাতাসীকে বিয়ে করে যে লোকটা আড়কাঠিদের সঙ্গে আসাম অঞ্চলে চলে গিয়েছিল, আট বছর পরে সে সশরীরে ফিরেছে এবং দাবি করছে

তার স্বামিত্বের অধিকার মহাসোরগোল করে। বাতাসীকে মারধোর করেছে খুব। মার খেয়েও বাতাসী কিন্তু মাস্টারের নাম বলে নি। অন্ধকার ঘরে মাস্টার এপাশ-ওপাশ করছে একা বিছানায় শুয়ে। বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ছে বার বার, বিশেষ করে বাঁ গালের উপর বেতের কালো তির্যক দাগটা। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে মাস্টার উঠে বসল, আলো জ্বেলে তোরঙ্গটা খুললে, তারপর তোরঙ্গর তলা থেকে বার করলে দুশো টাকার একতাড়া নোট, অর্থাৎ বছর খানেক চাকরি করে সে কায়ক্লেশে যে কটা টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিল তার সমস্তই। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নোটের তাড়াটা বুক-পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ল সে। গভীর রাত্রি, নির্জন পথ। ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল দু-একটা কুকুর, চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল দূরে। সাপে ব্যাঙ ধরলে যেমন একটা আওয়াজ হয়, তেমনই একটা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল,—মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর ভেকের আওয়াজ নয়, এক জাতীয় পেচক-দম্পতীর বিশ্রম্ভালাপ। মাস্টারের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা গিয়ে উঠল সে বাতাসীর বাড়িতে। ডাক দিতেই বাতাসী বেরিয়ে এল। চোখে হরিণীর মতো ভীরু দৃষ্টি।

"তোর স্বামীকে ডেকে দে।"

"কেন—"

"দরকার আছে—"

ডাকতে হল না, আপনিই বেরিয়ে এল সে

দুশমনের মতো চেহারা। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরের উপরার্ধ, অনেকটা গরিলার মতো। মুখে গোঁফ দাড়ি ভ্রূ কিচ্ছু নেই, আছে কেবল ছোট ছোট এক জোড়া চোখ, প্রাণ-হীন দৃষ্টি তাতে। একমাথা বাবরি-করা চুল। নাকটা থ্যাবড়ানো, ডগের দিকটা একটু বাঁকাও। নাকের ঠিক নীচেই গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। মাস্টারের ফরসা জামা-কাপড়ের জন্যই হোক, কিংবা অভ্যাসবশতই হোক, লোকটা বেরিয়ে এসেই মাস্টারকে সেলাম করলে। মাস্টার নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এরই স্ত্রী বাতাসী! তারপর অতিশয় অবান্তর প্রশ্ন করে বসল একটা।

"তোমার নাকের ওখানটায় কি হয়েছিল ?"

"ম্যানেজার সাহেব লাথি মেরেছিল।"

"কোথাকার ম্যানেজার ?"

"চা-বাগানের।"

থতমত খেয়ে গেল মাস্টার। নিজেকে ওই ম্যানেজারের সমশ্রেণীর বলে মনে হতে লাগল। খানিকক্ষণ কোনো কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। লোকটাও হাঁ করে চেয়ে রইল। স্তব্ধতাকে সচকিত করে পাশের বৃহৎ বটগাছটায় কলরব করে উঠল কতকগুলো পাখি একযোগে, গ্রামপ্রান্তে ডেকে উঠল এক দল শেয়াল। যামিনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হল। মাস্টারের চমক ভাঙল।

"শোন—"

"আমাকে ডাকছেন?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে লোকটা।

"হ্যাঁ, তোমাকেই। তুমি বাতাসীর স্বামী তো?"

"হ্যাঁ হুজুর—"

ঘাড় ফিরিয়ে বাতাসীর দিকে চাইতে গেল, কিন্তু বাতাসী ছিল না, ভিতরে চলে গিয়েছিল।

"তোমার সঙ্গে ছুটো কথা আছে আমার। এস আমার সঙ্গে।"

"এত রাতে কোথা যাব?"

"ভয় নেই তোমার, এস না!"

লোকটা দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর বললে, "একটু দাঁড়ান তা হলে, তালাটা লাগিয়ে আসি—"

মাস্টার কিছু বলবার আগেই চলে গেল। শব্দ হল কাকে যেন ভেতরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দড়াম করে কপাট লাগিয়ে শিকল তুলে দিলে। তালায় চাবি লাগানোর শব্দটাও পাওয়া গেল। মাস্টার নিঃশব্দে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

লোকটা বেরিয়ে এল।

"চলুন—"

খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠটায় এসে পৌঁছল ছুজনে। চাঁদ উঠছে।

"বস—"

দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসল। অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করলে মাস্টার, এতটুকু গোপন করলে না কিছু। সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে শেষে বললে, "বাতাসীর কোনো দোষ নেই, সব দোষ আমার, ওকে কিছু বোলো না তুমি। ইচ্ছে কর তো আমাকে খুন করতে পার।"

"খুন করব ? আপনাকে ? রাম রাম, কি যে বলেন, আপনি হলেন একটা মহাপুরুষ লোক—"

ছোটলোকদের কাছ থেকেও মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যঙ্গ-রসের নমুনা পাওয়া যায়। মাস্টার নীরবে হজম করলে খোঁচাটা। বরং আঘাত পেয়ে একটু যেন আরামই পেলে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই কদর্য লোকটার অসহায় চাহনি এতক্ষণ যেন পীড়িত করছিল তাকে। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল নীরবে। হঠাৎ লোকটার মুখে ফুটে উঠল একটা কুৎসিত হাসি, নাকের নীচের ক্ষতচিহ্নটা কুঁকড়ে বেঁকে গেল, একটা কালো কেন্নো যেন নড়ে চড়ে উঠল।

"বেশ, আপনিই নিন তবে ওকে। আপনার কাছেই থাকুক ও।"

তালার চাবিটা বাড়িয়ে ধরলে। "গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেলেই আমি চা-বাগানে ফিরে যাব—"

"আমি ওকে নিতে চাই না। তুমিই নিয়ে যাও।"

বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে।

"পরের বোঝা ঘাড়ে করে কোথায় ঘুরব আমি ?"

মাস্টারের বলতে ইচ্ছে করল, "পরের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ানোটাই তো তোমার পেশা বাপু, চায়ের বাগানে যে বোঝা বয়ে বেড়িয়েছ এতকাল, তা কি তোমার নিজের ?" বলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু বললে না।

বললে, "না, তুমিই নিয়ে যাও! হাজার হোক, তোমার বিয়ে-করা বউ। খরচপত্তর যা লাগে, তা আমি দিচ্ছি—"

"কত দেবেন ?"

"দু শো—"

মাস্টারের অভিজ্ঞতা কম, তাই একবারেই সবটা বলে ফেললে, দরদস্তুর করবার কথা মনে হল না। পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বার করতেই লোকটা লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাতেও নোট চিনতে ভুল হয় নি তার। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জিব বার করে ঠোঁট দুটো চাটলে, তারপর বললে, "দু শো টাকা বড় কম হয় হুজুর, এত বড় একটা ঝুঁকি ঘাড়ে করা, গরিব মানুষ আমি—"

বাঁ হাতের অনামিকায় দামী পাথর-বসানো একটা সোনার আংটি ছিল মাস্টারের। নির্বিকার চিত্তে সেটাও খুলে দিয়ে মাস্টার বললে, "বেশ, এটাও নাও, কালই কিন্তু চলে যেতে হবে এখান থেকে। আর কেউ যেন না এ কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে।"

"যে আজ্ঞে—"

টাকা আর আংটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর ঝুঁকে সেলাম করে চলে গেল। চুপ করে বসে রইল মাস্টার। কিছুদূর গিয়ে লোকটা আবার ফিরে এল।

"আপনি লোকটি কে, তা তো বুঝতে পারলাম না হুজুর—"

"আমি এখানকার স্কুলের থার্ড মাস্টার—"

"ও!"

রোমহীন ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"ছেলেদের পড়ান আপনি ?"

"হ্যাঁ—"

আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

"আচ্ছা আসি তবে—"

ঝুঁকে, একটু বেশি রকম ঝুঁকে, সেলাম করে চলে গেল। মাস্টার বসে রইল চুপ করেই, আকাশের দিকে চাইলে একবার। কুচকুচে কালো আকাশে মেঘের লেশ নেই, একেবারে নির্মল, মকর রাশির যুগ্ম নক্ষত্র দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, তার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটিতে ব্যঙ্গের হাসি।

সে। এত বড় পুণ্য কর্ম করে শেষে আপনি অনুতাপ করেছিলেন। এখনও করেন বোধ হয়।

আমি। সঙ্গত কারণ আছে তার। লোকটা যাবার সময় আংটি দেখিয়ে আমার নামে নালিশ করে গিয়েছিল স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে, ফলে আমার চাকরি যায়। বাতাসীকেও সে দূর করে দিয়েছে শুনেছি। আগে সন্দেহ করলে, কিছু দিতাম না, তা ঠিক।

সে। দ্বীপান্তরে যাবার পরও অনুতাপ করবার অনুরূপ সঙ্গত কারণ জুটত আপনার। অনেকের জুটেওছে।

আমি। প্রত্যেক কাজের ফলাফল অনুসারেই লোকে আনন্দিত অথবা অনুতপ্ত হবে, এ আর বিচিত্র কি!

সে। প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামান আপনারা। ভিখারীকে একটা পয়সা দেবার আগেও গবেষণা করেন, লোকটা পয়সাটা নিয়ে কি করবে, গাঁজা খাবে, না ছাতু খাবে।

আমি। দূরদর্শিতা জিনিসটা তো খারাপ নয়।

সে। নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এক রকম হওয়াই ভালো। নিছক অদূরদর্শী লোককেও ভালোবাসা শক্ত নয়, কিন্তু যারা সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে কখনও দূরদর্শী, কখনও অদূরদর্শী হয়, তাদের শ্রদ্ধা করা যায় না। তা ছাড়া দু নৌকায় পা দিয়ে চলাও শক্ত, শেষ পর্যন্ত তাতে ডুবতে হয়।

আমি। আমি দু নৌকায় পা দিয়েছি?

সে। দিয়েছেন বইকি!

আমি। নৌকো দুটোর নাম?

সে। স্বার্থ এবং ত্যাগ। সাময়িক একটা উচ্ছ্বাসে আপনি ত্যাগী সেজেছেন, কিন্তু যেই স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, অমনিই আবার পেছিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, পেছিয়ে আসাটার একটা চমৎকার ব্যাখ্যাও বার করেছেন সঙ্গে সঙ্গে, এইটে আরও মজার। আপনার দেশপ্রেম নারীপ্রেম দুটো ব্যাপারেই দেখুন।

আমি। দুটো ব্যাপারেই আমি পেছিয়ে এসেছি তা ঘটনা হিসাবে ঠিক, গোলমাল হচ্ছে নামকরণ নিয়ে। আপনি ওটাকে বলছেন—পলায়ন, আমি যদি বলি—সংশোধন? টেররিজ্‌ম্ বা বাতাসীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করা, এ দুটোর কোনোটাকেই আমি ভালো বলে মনে করি না।

সে। আমিও করি না। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা জিনিসটা তো ভালো নয়। আমার যতদূর মনে হয়, আপনার মনোভাব ঈশপের আঙুরলোভী শেয়ালটার মনোভাবের মতো অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চনা।

আমি। আত্মপ্রবঞ্চনা ?

সে। সারাজীবন তো তাই করেছেন ! ধরুন না, যে কারণে আই. এ. পাস করবার পর আপনি তালুকপুরে গিয়ে হাজির হলেন, সেই কারণটা আপনার কাছে কত বড় মনে হয়েছিল প্রথম প্রথম, কিন্তু—

আমি। মুরগি খাওয়া এখনও আমি পাপ বলে মনে করি না।

সে। তা হয়তো করেন না, কেই বা করে আজকাল, কিন্তু তখন যেটাকে একটা মহৎ কর্ম বলে মনে হয়েছিল, জীবনের একটা প্রধান প্রিন্সিপ্‌লের মর্যাদা দিয়েছিলেন তাকে—এত বড় যে, জন্মদাতা পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে তালুকপুরে চলে যেতে বাধে না তখন আপনার।

আমি। বাবার ওসব সেকেলে গোঁড়ামি আমি এখনও সমর্থন করি না।

সে। কিন্তু প্রতিবাদের জোরটা কমে এল, যেই সেখানকার চাকরিটা গেল। সুড়সুড় করে ফিরে এলেন সেই বাবারই কাছে আবার।

আমি। তালুকপুর থেকে আমি বাবার কাছে ফিরি নি।

সে। ফিরেছিলেন মামার কাছে তা ঠিক কিন্তু আপনার মামা যে আপনার হয়ে আপনার বাবার কাছে ওকালতি করছিলেন, সে কথা আপনি জানতেন। এমন কি তিনি মিছে

করে আপনার অনুতাপের এবং গোবর খাওয়ার কথা বলেছিলেন তাঁকে, তাও আপনার অবিদিত ছিল না।

আমি। কিন্তু বাবা যতক্ষণ না নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছেন, ততক্ষণ আমি যাই নি।

সে। আপনি তাঁর একমাত্র পুত্র, আপনার সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকা তো খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে ঘরে স্থান দিতে রাজী হন নি, যতক্ষণ না আপনার মামা এসে তাঁকে মিছে কথা বলে বোঝালেন যে, আপনি অনুতপ্ত এবং গোবর খেয়েছেন।

আমি। বাবা আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসাও করেন নি একবার।

সে। তিনি না করলেও আপনার কি তাঁকে স্পষ্ট বলা উচিত ছিল না যে, আমি গোবরও খাই নি, অনুতপ্তও নই, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে আবার মুরগি খাব, এ শুনেও যদি আপনি বাড়িতে স্থান দিতে রাজী থাকেন তবেই যাব।

আমি। বাবা অবুঝ, যুক্তির কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে, ওসব কথা বলে লাভ কি তাঁকে ?

সে। ওইটেই আত্মপ্রবঞ্চনা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার চিবুকেরগড়নটা বাতাসীর চিবুকের মতো, মালতীর মতো হাসবার ধরন, নাম-না-জানা বহুকাল পূর্বে দেখা সেই জেক মেয়েটির মতো গ্রীবাভঙ্গী। অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম

একটু। সেই জেক মেয়েটির কথাই মনে হতে লাগল বার বার। প্যারিসেরই একটা কাফেতে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, সমস্ত বিধি-বিধান অতিক্রম করে নিজেই এসে আলাপ করেছিল উপযাচিকার মতো। হেসে বলেছিল, সমাজের বিধি-বিধান মানতে মানতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, চতুর্দিকে কেবল ফর্ম, আর সেফটি ফার্স্ট! বিপদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি অ্যাডভেঞ্চার।

"তা হলে এখানে কেন, আফ্রিকায় যান—"

"ঠিক বলেছেন, এখানকার ভিড়টাও যেন ফ্যাকাশে গোছের, কেবল আপনাকেই একটু রঙিন মনে হচ্ছে, আপনার চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি পূর্বদিগন্তের রহস্যময় ওরিয়েণ্টাল স্বপ্ন, আসুন আপনার সঙ্গে নাচি একটু।"

সোনালী রঙের অলক দুলিয়ে আহ্বান করলে। নৃত্যপরা সেই মোহিনীর দেহের উত্তাপ এখনও অনুভব করছি যেন, চোখের উপর ভেসে উঠছে তার হাসি, চাহনি, বিশেষ করে তার বেশের বর্ণ-বাহুল্য। মজবুত মোটা টকটকে লাল কাপড়ে তৈরী মাথার টুপি, প্রশস্ত মাফলার, চমৎকার কাজ করা তাতে সোনার সুতোয়। দুগ্ধধবল ঢিলে জামা, ঘন নীল স্কার্ট। তন্বী, সুন্দরী, যৌবনরসে টলমল করছে।

সে। একটা কথা মনে আছে?

আমি। কি?

সে। নাচের পর তাকে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার

শিকারের যে গল্পটা করেছিলেন, সেটা আগাগোড়া বানানো? সুন্দরবনে আপনি কখনও যান নি। অথচ তাকে যখন গল্পটা বলছিলেন, তখন আপনার নিজেরও মনে হচ্ছিল যে, ঘটনাটা সত্যি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম।

সে। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে করতে মনের এমন নিদারুণ অবস্থা হয়েছে যে, আত্মহত্যা করাটাকেও বীরত্বের পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছেন শেষে।

আমি। প্রিয়তম জীবনকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে বীরত্ব আছে বইকি।

সে। থাকত, যদি ভরা-ভোগের মাঝখানে স্বেচ্ছায় তাকে ছাড়তে পারতেন। বাতাসীর মতো একটা সামান্য মেয়েকেও ভালোভাবে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই যার—

আমি। বাতাসীকে ভোগ করি নি?

সে। ওকে ভোগ করা বলেন? একটু বিপদের আভাস দেখেই রাত্তিরে চোরের মতো গিয়ে তার স্বামীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে আসার নাম—ভোগ করা? তার হাত ধরে সমস্ত বিঘ্ন বিপদ মাথায় নিয়ে সর্বনাশের অতলস্পর্শী গহ্বরে যদি নামতে পারতেন, তাহলেই তা ভোগের মর্যাদা পেত।

আমি। কিন্তু মজুরি পোষাত না।

কোনো উত্তর দিলে না সে।

বাতাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল বার বার। শুনেছি, লোকটা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কোথায় গেল সে, কি হল তার সন্তানের ?

সে। ভাল কথা, আপনি তো খুব মার্জিতরুচি লোক, ওই ছোটলোকের মেয়েটাকে ছুঁতে আপনার প্রবৃত্তি হল কি করে ?

আমি। আমার মনের গুহায় যে অদম্য আদিম পশুটা বেঁচে আছে, টগর তাকে লোলুপ করে তুলেছিল, কিন্তু ধরা দেয় নি, শেষ পর্যন্ত হয়তো দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় মুরগি খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, চলে যেতে হল তালুকপুরে, দেখা হল বাতাসীর সঙ্গে।

সে। টগর ধরা দিত না।

আমি। কেন ?

সে। কারণ তার বলিষ্ঠ স্বামী ছিল একজন। সতেরো-আঠারো বছরের একটা ছোঁড়ার মধ্যে বলিষ্ঠতর সে কিছুই দেখতে পায় নি।

আমি। হাব-ভাবে ইঙ্গিতে তবে সে আমাকে অমন লোলুপ করে তুলছিল কেন ?

সে। লোলুপ করে মজা দেখছিল।

আমি। মজা দেখছিল! কেন ? উদ্দেশ্যটা কি ?

সে। উদ্দেশ্য বোধ হয় আত্মপ্রসাদ। বড় শিকারীরা অনেক সময় কাকবগের দিকে গুলি ছোঁড়ে কাকবগের মাংসে

তার লোভ আছে বলে নয়, হাতের লক্ষ্য ঠিক অব্যর্থ আছে কি না পরখ করবার জন্যে। তার আসল কাম্য বাঘ-সিংহ। আপনি তখন লোভনীয় ছিলেন না।

আমি। কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে আপনি ?

সে। আপনি নিজে জানেন যে, যদিও সেটা স্বীকার করতে আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগে আপনার। সেদিন শেয়ালদা স্টেশনে প্যাসেঞ্জারের ভিড় ঠেলে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সে আপনাকে ভালো করে চিনতেই পারলে না। সুট্‌কেস, হোল্‌ডল, গয়নার বাক্স, স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ব্যস্ত সে। পূর্বস্মৃতিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না কই তো!

আমি। আট বছর আগেকার কথা, তাই হয়তো—

সে। আট কেন, আটাশ বছর পরেও জ্বলজ্বল করত আপনার মুখখানা তার বুকের ভেতর, যদি সত্যিই সে আপনাকে ভালোবাসত কোনোদিন।

বিস্ময় বাড়তে লাগল আমার। কে এ ? সত্যিই কোনো জাদুকরী নাকি ?

আমি। আমার এত রকম দুষ্কৃতির খবর জেনেও তো আপনি একা এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন! আপনার সাহস আছে বলতে হবে।

মুচকি হাসলে একটু।

সে। আপনার সব খবর ভালোভাবে রাখি বলেই সাহস

হয়েছে। বিলেতে যে সব 'ক্যাসুয়াল অ্যাফেয়ারে' লিপ্ত হয়েছিলেন, সেইগুলিই আমার ভরসা যদি বলি ?

আমি। তার মানে ?

সে। বহুবার টিকে নেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ মারাত্মক রকম কিছু হবার সম্ভাবনা কম।

উত্তেজনাভরে উঠে বসতে গিয়ে মচকানো পা-টায় সমস্ত শরীরের ভার পড়ল, লাগল খুব। যন্ত্রণাটা বোধ হয় পরিস্ফুট হল চোখে-মুখে।

সে। দার্জিলিং থেকে নামবার সময় অত ঊর্ধ্বশ্বাসে না নামলেই পারতেন, ট্রেনের যথেষ্ট সময় ছিল। তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে পা-টা মচকে ফেললেন শুধু শুধু।

মনে হচ্ছে, এ জেন জাদুরও সীমা অতিক্রম করেছে।

সে। ব্যথাটা এখনও কমে নি ?

আমি। না।

সে। মিনতি বেচারী শেক দেবার জন্যে তো কতবার এল কেতলি হাতে করে, আপনি আমলই দিলেন না তাকে ! বেচারী !

কি বলব, চুপ করে রইলাম। তার চোখের কোণে একটা দুষ্টু হাসি উঁকি মারতে লাগল।

সে। চুপ করে আছেন যে ?

আমি। কি আর বলব বলুন ? আপনি বদ্ধপরিকর হয়ে

এসেছেন আমাকে অপমান করবেন বলে, প্রতিবাদ করা নিষ্ফল, কেন এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না। কেবল ভাবছি, কখন শেষ হবে!

সে। একটাও মিছে কথা বলেছি কি? সত্যি যা জানি তাই বলেছি, তাও অপরের কাছে নয়, আপনারই কাছে।

আমি। আর কত বাকী আছে।

সে। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ভাবছি, রাগ করবেন, না বিস্মিত হবেন!

আমি। রাগ করলে তা প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হব। আপনি অসঙ্কোচে যা খুশি করতে পারেন, যা ইচ্ছে বলতে পারেন, কারণ আপনি মহিলা। আমার সে সুবিধে নেই। কি বলবেন, বলুন?

সে। আপনার আমন্ত্রণেই আমার অস্তিত্ব এখানে সম্ভব হয়েছে।

আমি। আমার আমন্ত্রণে?

সে। আমন্ত্রণে না বলে 'তাগিদে' বললে আরও ঠিক হয়। বস্তুত আপনিই আমাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছেন নিজের সামনে, অথচ সে কথাটা নিজেই ভুলে যাচ্ছেন।

আমি। বলেন কি! আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? একটুও মনে পড়ছে না তো! মালতীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আসতে রাজী হল না।

সে। সে যে এখন মিসেস গুপ্ত, যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে কি সে, হলই বা রমেশবাবু আপনার বন্ধু!

আমি। থাক তার কথা, আপনার কথা বলুন। কবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? ইদানীং আমার স্মৃতিশক্তি কম হয়ে গেছে তা ঠিক, কিন্তু তবু এতবড় একটা ব্যাপার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আজ রাত্রে আর কাউকে নিমন্ত্রণ করতেই পারি না যে!

সে। ন্যান্সি যদি আসে?

আমি। কোন ন্যান্সি?

সে। এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? পিকাডিলির হোটেলের সেই ওয়েট্রেস। মালতীর বাবা যখন আপনাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন, তখন যার উপার্জনে ভাগ বসিয়ে বিলাত-প্রবাসের শেষের দিন কটা কাটিয়েছিলেন, মনে নেই তাকে? সে হয়তো এখনও আপনার পথ চেয়ে আছে।

আমি। আমি তার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সে। সে কিন্তু টাকা চায় নি।

আমি। আপনি কে, বলুন, আপনি কে—।

সে। বিশ্বাস করবেন? যদি বলি, আমিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, যাকে আপনি নির্বিচারে সহ্য করে এসেছেন এতকাল, যে আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে, অবসন্ন করেছে—

আমি। তার মানে?

সে। মানে, যদি বলি, আমি আপনার অন্তরতম, বিশ্বাস করবেন? আজ সকালে মালতীর ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের ফাঁকে ফাঁকে যখন মালতীকে দেখছিলেন, তখন আপনি মালতীকে দেখছিলেন না, আমাকেই দেখছিলেন।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। আমি কি একটা বলতে গেলাম। আলো নিবে গেল হঠাৎ।

ধূ ধূ করছে মরুভূমি চারিদিকে। আরবের ঊষর মরুভূমি। ঊষর কিন্তু সুন্দর, ভীষণ কিন্তু মুগ্ধ করে। সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার স্বর্ণদীপ্তি জ্বলছে এখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ বালু-গিরিশ্রেণীর শিখরে শিখরে। বেশিক্ষণ জ্বলবে না, এখনই নামবে অন্ধকার, গিরিশ্রেণীগুলির পূর্বসানুদেশে ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, বালি ছাড়া আর কিছুই নেই—উঁচু নীচু ছোট বড় বালির পাহাড় কেবল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল-তরঙ্গসমাকুল একটা মহাসমুদ্র যেন মন্ত্রবলে বালুময় হয়ে গেছে। উত্তাল তরঙ্গ, উত্তাল কিন্তু গতিহীন, নীল স্বচ্ছ নয়, ধূসর অস্বচ্ছ। স্তব্ধ স্তম্ভিত মূর্তি। এই স্তব্ধতাও বেশিক্ষণ থাকবে না, আঁধি আসবে, আসবে প্রলয়ঙ্কর সাইমুম, অবলুপ্ত হয়ে যাবে গিরিশ্রেণী দেখতে দেখতে, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার শান্ত হবে সব, আকাশ নির্মল হবে, নবীন সূর্য নবসৃষ্ট গিরিরাজির উপর বর্ষণ করবে নবময়ূখমালা।

দূরে উটের সারি চলেছে। বিরাট আকাশের উদার পট-ভূমিকায় চলেছে বণিকের দল। অতি মনোরম দেখাচ্ছে। কবির চোখে যত মনোরম দেখায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মনোরম দেখাচ্ছে আমার চোখে। শক্ত হয়ে উঠছে শরীরের পেশীগুলো,

চঞ্চলতর হয়ে উঠছে শোণিতপ্রবাহ, চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছে, তীক্ষ্ণ বর্শাটাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরছি।···উটের সারি চলেছে, বণিকের দল প্রবেশ করেছে আমাদের সীমানায় বিনা অনুমতিতে। মূল্য দিতে হবে, শুল্ক দিতে হবে, অমনই ছেড়ে দেব না। আমরা ধনী নই, বিলাসের কোলে লালিত আদুরে দুলাল নই, আমাদের সম্বল শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, নিষ্ঠুরতা। বেদুঈন আমরা, মরুচারী দস্যু। মরুভূমির মতোই শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত নির্মম, মরুভূমির মতোই প্রসারিত করে দিয়েছি নিজেদের জীবন ওই দূর দিগন্ত পর্যন্ত। কোথাও বাসা বাঁধি নি, কোথাও আটকা পড়ি নি। বাস করি তাঁবুতে, চারণভূমির সন্ধানে ঘুরে বেড়াই দিক হতে দিগন্তরে। মরুভূমিতেই আমাদের প্রাণ, মরুভূমিতেই আমাদের মরণ, এই আমাদের রাজ্য, এই আমাদের কবরস্থান। এখানে কারও প্রবেশ-অধিকার নেই। প্রবেশ করে কেউ যদি, মূল্য দিতে হবে, মূল্য আদায় করে নেব। বাহুর পেশীতে শক্তি আছে, বর্শাফলকে তীক্ষ্ণতা আছে।

আলোছায়া-খচিত মরুভূমির এই প্রদোষ-আলোকে তাই অশ্বারোহী বেদুঈন আমি ওই উটের সারির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, সঙ্গীরা সবাই চেয়ে আছে। হঠাৎ দৃষ্টি-বিনিময় হল সকলের, ঘোড়ার লাগামে ইশারা সঞ্চারিত হল, তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, আকাশ জুড়ে বালি উড়ল। দেখতে দেখতে তাদের নিকটবর্তী হলাম, একপাল ক্ষুধিত নেকড়ের মতো ঘিরে

ফেললাম তাদের। উটের উপর থেকে গুলি করলে কে একজন. ক্ষেপে উঠলাম আমরা। শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুতে ফিরছি। সঙ্গে লুটের মাল, বন্দী-বন্দিনীর দল। বন্দিনী মাত্র একজন, সম্ভ্রান্তবংশীয় মিশরীয় রমণী বোধ হয় কোনো. মুখ দেখা যাচ্ছে না, মুখের সামনে দুলছে রেশমের ঘন-নীল জালিকা। মুখ দেখবার চেষ্টাও করি নি আমরা, ওকে চাই না, চাই অর্থ ওর বিনিময়ে। শেখ আজ খুশী হবেন খুব, অভিযান সফল হয়েছে। দলের মালিক কিন্তু ধরা পড়ে নি, একজন নিহত বেদুঈনের ঘোড়া নিয়ে তীরবেগে সে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়, ধরা গেল না। কিন্তু তার অনুচরদের বন্দী করেছি, বেগমকেও। কাপুরুষ যদি না হয়, ফিরতেই হবে তাকে। প্রচুর অর্থ দিয়ে উদ্ধার করতে হবে এদের।

অন্ধকার রাত্রি···দেহ ক্লান্ত। দূরে গাঢ়তর অন্ধকারপুঞ্জের মাঝখানে ছোট ছোট আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওয়েসিসের মাঝখানে আমাদের তাঁবু। এখানে কাল আর তাঁবু থাকবে না, এখানকার ঘাস নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ঠিক বাইরে বসে প্রকাণ্ড চামড়ার মশকে দুধ ঝাঁকাচ্ছে

শেখের দুটি মেয়ে। দুজনেই নব-যৌবনা। আমাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একজনের মুখ, ঊর্ধ্বমুখী চোখের দৃষ্টিতে দপ করে জ্বলে উঠল খুশির আলো, আলোক বিচ্ছুরিত হল বিকশিত দন্তরাজি থেকে। সঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইছে দেখে সামলে নিলে নিজেকে। টকটকে লাল রুমালটা কপালে ফিতের মতো বাঁধা, আটকে রেখেছে কোঁকড়ানো চুলের রাশিকে। পরেছে কালচে-সবুজ রঙের মোটাসোটা কাপড়টা সর্বাঙ্গে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে। পাড়ের উজ্জ্বল সবুজ, প্রখর লাল, সোনালী হলুদ অদ্ভুত দেখাচ্ছে আলো-আঁধারিতে। এত বেশি দুধ ঝাঁকানো হচ্ছে, সম্ভবত বেশি মাখনের প্রয়োজন আজ। শেখ বোধ হয় অতিথিসৎকার করছেন। কফির সরঞ্জামও প্রস্তুত হচ্ছে তা হলে তাঁবুর ভিতরে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ভিতর ফরাশ বিছানো হয়েছে। খেতে বসেছি আমরা। অর্ধপক্ক মাংস আর ধূমায়িত ভাত পরম তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছি। ইয়োরোপীয়ান পর্যটক এসেছেন একজন, শেখের আতিথ্য স্বীকার করেছেন আর একজন শেখের পরিচয়পত্র নিয়ে। অতিথির সম্বর্ধনাকল্পে ওসমান বাঁশিতে গজল ধরেছে, গোলাপী আতর মেশানো হচ্ছে গরম কফিতে, শেখ অতিথির সঙ্গে আলাপ করবার বৃথা চেষ্টা করছেন ভাষার পার্থক্য

সত্ত্বেও। এমন সময় হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল তাঁবুর পিছন দিকে, পরদার ওপারে মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। বিদ্যুৎবেগে দাঁড়ালেন শেখ, নিমেষের মধ্যে হাত চলে গেল আবার নীচে, সঙ্গে সঙ্গে চকমক করে উঠল বাঁকা ছোরাখানা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে, ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে গেলাম। সেই পলাতক মালিক ফিরেছে, আমাদের ঘোড়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। সে এসেই ছোঁ মেরে তার বেগমকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

আমরাও ছুটলাম। সমস্ত রাত পশ্চাদ্ধাবন করলাম তার। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল, আগুনের গোলার মতো সূর্য উঠল অগ্নিবর্ষণ করতে করতে। তবু ছুটছি। হঠাৎ তার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল একটা বালিয়াড়ির চড়াই ভাঙতে গিয়ে, ছিটকে পড়ল দুজনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে হাজির হলাম। তার মুখের জালিকা খসে পড়েছে, আতঙ্কে ক্লান্তিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি—এ যে মালতী আর রমেশ। প্রফেসার রমেশ গুপ্ত ও তার স্ত্রী মালতী দেবী।

"বাঁচাও আমাকে—"

মালতী আর্তনাদ করে উঠল।

বাঁচাব? কি করে? হিংস্র বেদুঈন আমি? ইচ্ছে হল

অট্টহাস্য করে সে কথাটা জানিয়ে দিই তাকে। ও কিসের শব্দ? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি আকাশ অন্ধকার করে ঝড় আসছে, সাইমুম-দৈত্য ক্ষেপে উঠেছে সহসা। এল—এল— এসে পড়ল। বালির ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম, চোখে মুখে নাকে ভীমবেগে এসে লাগছে অসংখ্য বালুকণা নয়, অসংখ্য ছররা। দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মালতীরই পদপ্রান্তে।

আলো জ্বলে উঠল।

নিগূঢ় রহস্যের মতো সে বসে আছে সামনে।

কোনো কথা বললে না।

আমি। রবীন্দ্রনাথের "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন" কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যিই আমি মরুভূমির স্বপ্ন দেখছিলাম আজ সকালে।

সে। কবিতাটির মতো স্বপ্নটাও পুঁথিগত।

আমি। তার মানে?

সে। মানে, ইংরেজী কেতাবে বেদুঈনদের বিষয়ে যা পড়েছেন, তাই ভাবছিলেন। আপনার কাছে রেড ইণ্ডিয়ান, এস্‌কিমো, জাপানী, ইহুদী, বেদুঈন, সমস্তই হয় কোনো কেতাবের কথা না হয় কোনো সিনেমার ছবি।

আমি। হলই বা—

সে। সুতরাং সব সময় সত্য নয়।

আমি। তাতেই বা ক্ষতি কি?

সে। ক্ষতি কিছু নেই। পরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আস্ফালন করা বা পরের দেখা স্বপ্নের চর্বিতচর্বণ করা আপনার মনের বিশেষ লক্ষণ, এই আর কি—অর্থাৎ সোফায় ঠেস দিয়ে যতটুকু হয়—

আমি। এ বক্রোক্তির অর্থ কি?

সে। অর্থ, সত্যের দিকে আপনার ততটা আগ্রহ নেই, যতটা আছে স্বপ্নবিলাসের দিকে। সত্যি আরবের মরুভূমিতে গিয়ে বেছুঈনদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাপন করতেন যদি, তা হলে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য রকম হত, আপনার স্বপ্নে ভিন্ন রকম বর্ণ-সমাবেশ করতে পারতেন, অর্থাৎ তা কতকটা আপনার নিজস্ব দর্শন হত।

আমি। কতকটা?

সে। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ সমগ্ররূপে জানা সহজ নাকি? এই একই মালতীরই তো কত বিভিন্ন রূপ দেখলেন এই ক-বছরে, তার সবগুলোই আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রত্যেকটি কত বিভিন্ন!

আমি। মালতীর কথা ছেড়ে দিন, পরের অভিজ্ঞতা যে সত্য নয়, এ কথা কি করে বলছেন আপনি?

সে। ঠিক বলেই বলছি। আপনি বুঝতে পারছেন না, তার কারণ প্রক্সি দেওয়ার যুগ এটা, সিনেমার নির্জীব পরদায় অলীক ছায়াচিত্রকে জীবনের সত্য চিত্র বলে ভুল করবার যুগ। আপনার দোষ নেই।

আমি। জ্ঞান বলে আমরা যা কিছু আহরণ করি, তার অধিকাংশই তো পরের অভিজ্ঞতা।

সে। পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি যাচিয়ে না নেন, তা হলে তা নিরর্থক। ঝালের সম্বন্ধে যদি

সত্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে তা পরস্পরের মুখে খেলে চলে কি ?

আমি। কিন্তু বিজ্ঞানের বেলায় আমরা দেখছি যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা সত্য।

সে। বিজ্ঞান যে সব সত্য নিয়ে আলোচনা করে তা চিরন্তন সত্য, তা অবৈজ্ঞানিকের কাছেও প্রত্যক্ষ, ধরুন—আলো বা বিদ্যুৎ। থিওরি নিয়েই যত গোলমাল, আজকের থিওরি তাই কাল বাতিলও হয়ে যাচ্ছে। নূতন দ্রষ্টা পুরাতন সত্যের নূতন ব্যাখ্যা বার করছেন। ডারউইনের সঙ্গে যাঁরা একমত নন, তাঁদের দৃষ্টিও কম স্বচ্ছ বা তাঁদের যুক্তিও কম জোরালো নয়।

আমি। অধিকাংশের মতে ডারউইন কিন্তু এখনও—

সে। দেখুন, "অধিকাংশের মতে" এই বাক্যটা সত্যের বেলায় খাটে না। অধিকাংশ লোক বোকা, অধিকাংশ লোক স্বার্থপর, অধিকাংশ লোক অহঙ্কারী। তারা কোনো কথায় সায় দেয় হয় না বুঝে, না হয় স্বার্থের খাতিরে, কিংবা অহঙ্কারবশত। যিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করে সত্যের সন্ধান করেন, তিনি অধিকাংশের কথা মানবেন কেন? তাঁর কাছে তাঁর নিজের মতটাই একমাত্র সত্য, কারণ সে মত তিনি গঠন করেছেন পলে পলে কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।

আমি। অধিকাংশ লোকের মত হলেই যে তা মূল্যহীন

হতেই হবে, এ কথা স্বীকার করতে পারব না, মাপ করবেন।

সে। পারবেন কি করে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ যে? আচ্ছা, মালতীকে আপনার কেমন লাগে, তা কি আপনি ভোট নিয়ে ঠিক করবেন? মালতীর সম্বন্ধে আপনার সত্য মত কি আর কারও সহানুভূতি বা বিরুদ্ধতার অপেক্ষা রাখে? রবি ঠাকুরের কোন কবিতাটা ভালো, তা ভোট নিয়ে ঠিক করলে আপনার মনের মতো হবে কি?

আমি। ওসব তো ব্যক্তিগত কথা।

সে। সত্যও ব্যক্তিগত জিনিস। আপনার কাছে যা পরম সত্য, অপরের কাছে তা পরম মিথ্যা। মালতীকে আপনার ভালো লাগে, কিন্তু পুরন্দর সেন একটুও পছন্দ করে নি তাকে।

আমি। তা জানি। পুরন্দর সেন কিন্তু ব্যতিক্রম, অধিকাংশ লোকেরই মালতীকে ভালো লাগে। রমেশ তো ওর কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বাস আর কারও দেখি নি।

সে। সেইজন্যেই সন্দেহ হয়, কোনোখানে কিছু গলদ আছে।

আমি। কেন?

সে। শূন্যকুম্ভই শব্দ করে, পূর্ণকুম্ভ করে না। কুম্ভটা যে শূন্য, আজই তো আপনি তার প্রমাণও পেলেন চাক্ষুষ।

আমি। আপনি কি করে জানলেন?

সে। সমস্ত কথা যা করে জেনেছি।

আমি। কিন্তু মালতীর মুখ দেখে একদিনও মনে হয় নি যে—

সে। ভুলে যাবেন না, মালতী মেয়েমানুষ। তার মুখ দেখে তার বয়সটা পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেন না, তার মনের কথা টের পাবেন? তার লেখা চিঠি পড়ে তার মনের কথা বুঝতে পারেন নি, মুখ দেখে পারবেন?

চিঠিখানার কথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

সে। চিঠিখানা সর্বদা সঙ্গে দিয়ে ঘোরার মধ্যে যে কুসংস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল, একটা মাদুলি হাতে বেঁধে ঘোরার মধ্যে তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। অথচ মায়ের কথাতেও আপনি মাদুলি পরতে রাজী হন নি, আশ্চর্য লোক আপনি!

মালতী সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই একেবারে। তাকে আমি মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চাই। কথা-টার মোড় ফিরিয়ে দিলাম।

আমি। তর্কের আবর্তে কিন্তু একটা দরকারী কথা তলিয়ে গেছে।

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখে।

সে। কি দরকারী কথা?

আমি। একটু আগে আপনি যা বলে নিজের পরিচয় দিলেন তা কি—

সে। অমনই বিশ্বাস করে বসে আছেন তো! উঃ, কি

বিশ্বাসপ্রবণ মন আপনাদের! যত অবিশ্বাস কেবল ধর্মের বেলা। কিন্তু ধর্মপুস্তকও তো ছাপার হরপে বেরিয়েছে আজকাল।

আমি। আপনাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

সে। চাণক্য পণ্ডিত মানা করে গেলে কি হবে, স্ত্রীলোকদের আর রাজপুরুষদের অবিশ্বাস করবার শক্তি বাঙালী-চরিত্রে নেই।

আমি। ঠাট্টা করবেন না, সত্যি করে বলুন, কে আপনি—

সে। সে কথা গোড়াতেই বলেছি, আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

আমি। কি?

সে। আমি জাদুকরী।

আমি। এ রকম জাদু কি সম্ভব এ দেশে?

সে। যে দেশে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী এসে একটা রাজ্য জয় করে ফেলতে পারে, সে দেশে কি না সম্ভব! অত দূরে যাবার দরকার কি, এখুনি তো অসম্ভব ঘটনা ঘটল একটা, ঘটছে এখনও—

আমি। কি?

সে। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে কখনও দেখেন নি বলছেন, অথচ সেই আমি যেই বললাম, আমি আপনার অন্তরতম, অমনই সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠল। এর চেয়ে অদ্ভুত জাদু আর কী হতে পারে?

আমি। অপরিচিতা নন আপনি, যদিও ঠিক করতে পারছি না, কোথায় আলাপ হয়েছিল। তা ছাড়া, অদ্ভুত রকম ভালো লাগছে আপনার কথাবার্তা, তর্ক করছি শুধু তর্কের খাতিরে, আপনার সঙ্গে সত্যি সত্যি কোনো মতবিরোধ নেই, বরং আশ্চর্য রকম মিলই আছে।

সে। সর্বনাশ! আর তো তা হলে থাকা চলে না, উঠি এবার।

আমি। সে কি?

সে। আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সহজ আলাপের পথ আর সুগম থাকবে না।

আমি। কেন?

সে। রস-পিচ্ছিল হয়ে যাবে। আপনি আপনার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী লিখুন। অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়েছি আপনার, যদিও সেটা আমার দোষ নয়, ডেকেছিলেন বলেই এসেছিলাম এবং ফের যদি ডাকেন আসতে হবে। লিখুন এখন, চললাম।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল এবং আমি কিছু বলবার আগেই খোলা দ্বার দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর লিখতে শুরু করলাম।

নিজের জীবন-কাহিনী লিখছি কেন? যদি আর কেউ এ কাহিনী পড়ে শিক্ষালাভ করে? আমি তো কত লোকের জীবন-কাহিনী পড়েছি, কী লাভ হয়েছে তাতে আমার? তবে লিখছি কেন? হঠাৎ কণ্ঠস্বর ভেসে এল দ্বারপথে—"লিখছেন মালতী পড়বে এই আশায়"—তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু চেয়ে দেখলাম সে নেই। ভৌতিক কাণ্ড না কি! লিখতে বসে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। সত্যিই আমার জীবন সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমার পরিচয় মানুষ, কিন্তু আসলে আমি পশু-মানুষ, তার বেশি এক ধাপও উঠতে পারি নি। পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্যান্য পশুর আছে, তাও আমার নেই, তার জন্যেও প্রতি পদে অপরের করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছে। ভাবছি এমন কেন হল? এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি? আমাদের দেশে সকল ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য একটি—আমরা পরাধীন জাতি। আমরা যা ভাবি তা বলতে পারি না, যা করতে চাই তা করতে পারি না, ক্ষুধায় অন্ন পাই না, অসুখে ঔষধ পাই না মানুষের প্রধান সহায় যে শিক্ষা সে শিক্ষা আমরা পাই নি, তার বদলে পেয়েছি একটা ডিগ্রী, তার সঙ্গে খানিকটা অহমিকা এবং আদিম পশু-প্রবৃত্তিগুলোর বর্বরতাকে ঢাকবার জন্যে চটকদার

একটা আবরণ। বস্তুত মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে আমরা স্কুল-কলেজে ঢুকি না, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের অবিচ্ছিন্ন চর্চা করবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই ঢুকি। পাস করলেই চাকরি পাওয়া যাবে। একটা কান কেটে ফেললে যদি চাকরি পাওয়া যেত, দেশসুদ্ধ বাপ দেশসুদ্ধ ছেলের কান কেটে দিত বোধ হয়, স্কুল-কলেজে না ঢুকিয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ জাতীয় বইগুলো ছাড়া আর কোনো বই আগাগোড়া পড়ি নি, পড়বার দরকার হয় নি।

শেক্স্‌পীয়র, কালিদাস আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকে, কিন্তু সে সব পড়বার দরকার হয় না, নোট পড়লেই চলে। শিক্ষকেরা ক্লাসে ইম্পর্‌ট্যাণ্ট বলে যে অংশগুলো চিহ্নিত করে দেন, তাই পড়লেই অনায়াসে পাস করা যায়। পাস করাই উদ্দেশ্য। পাস করার জন্যে চুরি করতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, প্রাইভেট ট্যুশনির ব্যবস্থা করতে হয়, শিন্নি মানতে হয়, সুযোগ থাকলে পরীক্ষকদের খোশামোদ করতে হয়, করতে হয় না কেবল পাঠ্য বিষয়টা আয়ত্ত করবার চেষ্টা। করতে গেলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যে সব ছেলে বোকার মতো আগা-গোড়া সব পড়তে যায়, তারা পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো করে না। বেচারা সন্তোষের কথা মনে পড়ে, হুমড়ি খেয়ে সে মোটা মোটা বইগুলো আগাগোড়া পড়ত। পাস করেছিল কিন্তু

কোনোক্রমে। যে সব চালাক-চতুর ছেলেরা মাস্টারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের তোয়াজ করে নোট আর সাজেসশন সংগ্রহ করে বেড়াত, তারা ঢের বেশি নম্বর পেয়েছিল সন্তোষের চেয়ে। আমি আই. এ-তে ফার্স্ট হয়েছিলাম। তার কারণ, যে যে প্রশ্নগুলো আমি তৈরি করতে পেরেছিলাম ঠিক সেইগুলোই পরীক্ষায় পড়েছিল। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, তাদের ছোট করবার জন্যে আমি এ কথা লিখছি না, আমার জীবনে যা ঘটেছিল, তাই শুধু লিখছি। এই ফার্স্ট হওয়াটাই আমার জীবনের কাল হল। ফার্স্ট হয়েছিলাম বলেই মালতীদের পরিবারে আমল পেয়েছিলাম এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মালতীর বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের পাত্র হিসেবে আমাকে মনোনীত করে বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই. সি. এস. পড়বার জন্যে। বিলেত যাবার আগে মালতীকে বিয়ে করে গেলেই বোধ হয় ভালো হত, কিন্তু উপায় ছিল না, আইনে বাধল। আমি তখনও আইনের চক্ষে মাইনার, যদিও তখন আমার জীবনে টগর বাতাসী এসে গেছে। মাইনার ব্যাপারের একটু ইতিহাসও আছে অবশ্য। আমি যখন বিলেত যাই, তখন আমার আসল বয়স তেইশ, কিন্তু কাগজে কলমে আমি তখনও একুশে পড়ি নি, স্কুলে ভর্তি করবার সময় আমার মামা কিছু হাতে রেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু ভবিষ্যৎটা যে এমন হবে, তা তখন কে জানত!...

…"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে আমি চাই নি কোনো দান।" কে গাইছে এত রাত্রে? ঠিক যেন মালতীর গলা। মালতীকে দেখতে পাচ্ছি যেন—হ্যাঁ, মালতীই তো, আবেশময় চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত, পিয়ানো বাজাচ্ছে…

না, মালতীর কথা ভাবতে শুরু করলে লেখা এগুবে না। আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার মন ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তীব্রভাবে যে জিনিসটা মনে জাগছিল, তা পাঠস্পৃহা নয়, যৌনক্ষুধা। এই সুস্থ স্বাভাবিক ক্ষুধার আহার সমাজ আমাকে দেয় নি, এ ক্ষুধাকে দমন করবার কৌশল পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধু কেউ আমাকে শেখায় নি, বাতাসী টগর মালতীরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করেছে, আমি বাধা দিতে পারি নি, বাধা দিতে চাই নি। কামনার জয়গান শুনেছি সাহিত্যে, কামনার মূর্ত প্রকাশ দেখেছি আর্টে, ক্ষুধার অনলে ইন্ধন যুগিয়ে ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছে এরা। খাতার উপর পড়ল একি? দুটো টিকটিকি—একটা ছোট, একটা বড়। সরসর করে দেওয়ালে গিয়ে উঠল, নিস্পন্দ হয়ে দেওয়ালে লেগে রইল দুটোই কিছু দূরে দূরে, দুটোরই চোখের দৃষ্টি পলকহীন।

হ্যাঁ, কি লিখছিলাম? ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছিল।

সত্যিই হিতাহিতজ্ঞান ছিল না, কেবল মনে হত, 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'। কিন্তু যে বলিষ্ঠ পৌরুষ থাকলে ওই সকাম বৈরাগ্য জীবনে খাপ খায়, সে পৌরুষ, সে শক্তি ছিল না আমার। থাকবার কথাও নয়। কারণ প্রতি মাসে এক গাদা অর্থ ব্যয় করে হোস্টেলের অখাদ্য খেয়ে যে জিনিস লাভ করবার জন্যে আমরা দল বেঁধে উদ্বাহু হয়ে ছুটেছিলাম, তা শক্তিও নয়, পৌরুষও নয়, তা ডিগ্রী।

হাপরের মতো শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। হাসছেন গৌরীশঙ্কর রায়—"আজকালকার ছেলেগুলো, বোয়েছ করুণা, যাকে বলে হ্যাংলা—হে-হে।"

আমার বাবার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর রায়ের বন্ধুত্ব আছে। তাঁরা দুজনে একত্রিত হলেই একালের ছেলেদের মুণ্ডপাত করেন, মাঝে মাঝে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীও জোটেন এসে। সকলেরই বদ্ধ ধারণা, সেকালে তাঁরা সবাই রত্ন ছিলেন, একালে আমরা ঝুটো কাচ। আমরা যে ঝুটো কাচ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করছে না এই মুহূর্তে। মনে হচ্ছে, আমি যেন এই যুগের আন্তরিকতাবর্জিত মেকি আধুনিকতার অতি উজ্জ্বল প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে, জাতিভেদ মানি নি,

দেশী কুসংস্কার বর্জন করে বিদেশী কুসংস্কার অর্জন করেছি, বিলেত গেছি, সেখানে নিজের ভাবপ্রবণতাবশত কোনো বিদ্যা বা ডিগ্রী আহরণ করতে না পেরে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা সম্বন্ধে অবজ্ঞা এবং যে কোনো ডিগ্রী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ-শোভন ঔদাসীন্যের ভান করেছি, নিজের অসংযত কামনাকে সংযত করবার চেষ্টা করি নি একটুও, বরং তার গুণগান করেছি শতমুখে—

কিসের শব্দ হচ্ছে? ঝড় আসছে নাকি? ও, মিনতি স্টোভ জ্বালছে বোধ হয় দোতলায়। কি বিরক্তিকর একটা আপদ এসে জুটেছে বাড়িতে! বাবাকে রাত তিনটের সময় উঠে চা করে দেয় বলে বোধ হয় বাবা খুব খুশী। যে কোনো একটা চাকরানীকে মাইনে দিলেই তো সে ভোরে এসে চা করে দেবে, সেই গৃহকর্মনিপুণাকে বিয়ে করতে হবে সেইজন্যে—

হ্যাঁ, কি লিখছিলাম? বিলেতে গিয়ে কিছু করি নি। স্বোপার্জিত অর্থে নয়, মালতীর বাবার টাকায় মদ খেয়েছি, খানা খেয়েছি, রিভিয়েরা গেছি, মন্টি কার্লো গেছি, প্রেম কিনেছি, প্রেম বিলিয়েছি, ফ্যাশনেব্‌ল দোকানের দামী স্যুট গায়ে চড়িয়ে ন্যান্সির কাছে নিজেকে বিবাগী রাজপুত্র বলে প্রচার করেছি। মাঝে মাঝে স্বদেশপ্রেমও জেগেছে। ভারতবর্ষের হিতার্থে সভা-সমিতির আয়োজন করে দু-চার-

জন সাহেবকে ডিনার খাইয়েছি এবং প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, সে খবরটা যাতে আমার নামসুদ্ধ (এবং সম্ভব হলে ছবিসুদ্ধ) ছাপা হয় স্বদেশ-বিদেশের কাগজে, শ্রমিকবাদ ধনিকবাদ নাৎসিবাদ নিয়ে বাদানুবাদ করেছি যেখানে সেখানে, এমন কি মদের ঝোঁকে সঙ্কল্পও করেছি মাঝে মাঝে যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। এ দেশের যে সব কর্মী সর্বস্ব বিসর্জন করে আজীবন দেশসেবা করছেন, তাঁদের 'শ্যাবি' কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছি ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে, যাঁরা বিলেত-ফেরত নন, তাঁদের প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব পোষণ করেছি মনে মনে বাইরে অতি-মার্জিত মোলায়েম মুখশোভা রক্ষা করে এবং এই সমস্তটার ওপর অতি-আধুনিকতার লেবেল মেরে সাহিত্য সমাজ রাজনীতি সব জিনিসকে ব্যঙ্গ করেছি স্বাধীন-চিন্ততার ছদ্মবেশে, গোপনে গোপনে কিন্তু একে ওকে তাকে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি একটা মোটা মাইনের চাকরির। বন্ধুদের মধ্যে রাজপুরুষদের নিন্দে করেছি, সফলকাম বিলেত ফেরতদের টিটকিরি দিয়েছি, কিন্তু তাদেরই দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়ে ফিরেছি বুভুক্ষু কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট প্রসাদের আশায়।

এই আমার সত্য চিত্র, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু যে সব প্রবীণ আমাদের দেখে নাক সেঁটকান, তাঁরা আমাদের চেয়ে কী হিসেবে ভালো? তাঁরা কি আমাদেরই পুরাতন সংস্করণ নন? তফাতের মধ্যে এই—

তাঁরা পুরাকালে যে সুবিধে ও সুযোগ পেয়েছিলেন, রাজ-নৈতিক কারণে আমরা তার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা সবাই কি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন? তাঁরাও তদানীন্তন ফ্যাশনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও হুজুগে উন্মত্ত হতেন, তাঁরাও চাকুরিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁদের আত্মম্ভরিতা বিশ্বাসঘাতকতা নীচতা নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। আমাদের মতো তাঁদেরও পদস্খলন হত। আমরা অর্থহীন বলে ভাঁওতার জোরে হঠাৎ-স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে প্রায়-নিখরচায় প্রণয়-চর্চা করি; তাঁরা অর্থবান ছিলেন বলে টাকার জোরে বেশ্যাবাড়ি যেতেন এবং বহু-বিবাহ করতেন। সেকালের ছেলেরা ডেভিড হেয়ারের বাড়ির সামনে ভিড় করত, ডেভিড হেয়ারের পালকির পিছনে ছুটত; একালের ছেলেরা সিনেমার সামনে ভিড় করে সিনেমা-স্টারের সিনেমা-ডিরেক্টারের পিছনে ছোটে। কারণ কিন্তু এক—হঠাৎ আলোর ঝলকানি; উদ্দেশ্যও এক—যদি মনের খোরাক এবং পেটের খোরাক জোটে। বর্ষাকালে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে যেমন দলে দলে নানারকম পোকা ছুটে আসে, আমরাও তেমনই ছুটে এসেছি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বর্তিকা লক্ষ্য করে। এই বর্তিকার নাম সেকালে ছিল—শিক্ষা, একালে তার অনেক নাম হয়েছে, দুটো যুগের বাইরের চেহারায় খানিকটা অমিল আছে, একই টাইফয়েড-

রোগীর ফার্স্ট উইক আর থার্ড উইকের চেহারায় যেমন অমিল থাকে। সেকালের লোকে ডিগ্রী পেলেই এবং অনেক সময় না পেলেও চাকরি পেত, তাই বিয়ে-থা করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কতকটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার সুযোগ পেত। একালে সে সুবিধে নেই, ডিগ্রী-আলেয়া একালের ছেলেদের যেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করছে, তা পঙ্কিল জলাভূমি, বিষ-বাষ্পে পরিপূর্ণ। দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে তারা। প্রবীণরা তাদের উদ্ধারের উপায় করেন না, ভেবে দেখেন না যে, তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ তাঁরা নিজেরাই। ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন করবার কোনও চেষ্টা কখনও করেন নি তাঁরা, ঠেলে ঠেলে কেবল স্কুল-কলেজে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা পাস করবার জন্যে চাকরির স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সে স্বপ্ন সফল হচ্ছে না একালে, সুতরাং একালের ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছেন সবাই মিলে। এটাও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। আসল গলদ যে কোথায়—

খুট করে শব্দ হল। চেয়ে দেখি, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সে। ফের ডাকছেন আমাকে?

আমি। কখন ডাকলাম!

সে। এখুনি। আর একটা ছবি দেখুন তাহলে। আলো নিবে গেল।

গং গং গং গং গং—

উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। পূর্বাকাশে ঊষার রক্তিম আভা দেখা যাচ্ছে সামান্য, রাত্রির অন্ধকার এখনও সম্পূর্ণ যায় নি। ছাত্রাবাসের ছোট ছোট ঘরগুলি আলোকিত হয়ে উঠছে একে একে। শিক্ষকদের ঘরগুলিও। গং গং গং গং—বেজে চলেছে ঘণ্টা গম্ভীর নির্ঘোষে, আহ্বান করছে সকলকে উপাসনা-মন্দিরে। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে সকলে সজ্জিত হচ্ছে নীরবে, যে সব বালকের ঘুম ভাঙে নি, শিক্ষকেরা তাদের নিদ্রাভঙ্গ করছেন, তাও নীরবে। নীরবতাই এখানকার নিয়ম। সকলেই মিতবাক্ মৃদুকণ্ঠ। বিনা প্রয়োজনে কথা বলা নিষেধ, কোলাহল করা একেবারে নিষেধ।···সজ্জিত হচ্ছে সবাই। খদ্দরের পরিধেয়, খদ্দরের উত্তরীয়—সব স্বহস্তে প্রস্তুত। ছাত্র, অধ্যাপক, আচার্য, পরিচালক সকলেরই এক সজ্জা—শুভ্র খদ্দর। এখানে পরিচ্ছদ-বৈষম্য নেই। আহার পরিচ্ছদ ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান। গং গং গং গং গং—বেজে চলেছে—ঠিক পনেরো মিনিট বাজবে। এর মধ্যে সকলকে পৌঁছতে হবে উপাসনা-মন্দিরে।

উঠলাম। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কুশাসন এবং উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আমিই পরিচালক, নিয়ামক, স্রষ্টা—তাই আমি সর্বাপেক্ষা বেশি

নিয়মানুবর্তী, সর্বাপেক্ষা বেশি নিষ্ঠাবান, সর্বাপেক্ষা বেশি নীরব।

চলেছি। শেষ রাত্রের স্বল্প অন্ধকারে শ্বেত-খদ্দরমণ্ডিত মূর্তিগুলিও চলেছে আমার আশেপাশে নীরবে। পাঁচ বছরের শিশু ষাট বছরের শিক্ষক—সবাই। উপাসনা-মন্দির জাঁক-জমকশালী হর্ম্য নয়, মাটির ঘর, কিন্তু প্রশস্ত। সকলে নীরবে গিয়ে উপবেশন করলাম স্ব স্ব আসনে। চোখ বুজে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা আচার্যের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

মনে মনে আবৃত্তি করলাম সকলে। স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। চোখ বুজে বসে রইলাম আরও খানিকক্ষণ। ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ—ভালো করে চিন্তা করতে লাগলাম এর অর্থ। আবার আচার্য বললেন, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

পুনরায় আবৃত্তি করলাম মনে মনে, উপলব্ধি করলাম প্রার্থনার তাৎপর্য। স্তব্ধতা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে এল। তৃতীয় বার আচার্য বললেন, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি। তৃতীয় বার আমরা

আবৃত্তি করলাম। প্রণাম করলাম তারপর। প্রণামান্তে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়েছে। সম্মুখে আচার্য দাঁড়িয়ে আছেন—সৌম্য শান্ত সমাহিত মূর্তি। যতীন।

উপাসনার পর ব্যায়াম, তারপর স্নান, তারপর পড়াশোনা।

উপাসনা-মন্দির থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছাত্ররা ব্যায়ামের জন্য সারি সারি দাঁড়াল। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

আমিও আমার ঘরে গিয়ে ব্যায়াম করব, স্নান করব। তার-পর আমাকেও অধ্যয়ন করতে হবে অধ্যাপনা করবার জন্যে।

দৃশ্য বদলাল।

জাপানী কবি নোগুচির বংশধরের সঙ্গে আলাপ করছি। তিনি এসেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠান দেখতে। অঙ্গে জাপানের জাতীয় পরিচ্ছদ, মুখে স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। চমৎবার বাংলা শিখেছেন।

"ভারি চমৎকার লাগল প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানকার নীরবতা। সবই হচ্ছে, অথচ কোনো গোলমাল নেই।"

স্মিত মুখে চুপ করে রইলাম। বলতে ইচ্ছে হল যে কল-রব করবার সাধনা আমাদের নয়। নীরবতাই ভারতের ধর্ম। ইচ্ছে হল, কিন্তু বললাম না। অকারণ কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন করলেন তিনি, "কত বছর বয়সের ছেলে নেন আপনারা ?"

"পাঁচ বছর, বড় জোর ছ বছর।"

"ক বছর থাকতে হয় এখানে—"

"বারো বছর।"

"কি কি পড়ানো হয় ?"

"প্রয়োজনীয় সবই। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রাথমিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু—"

"এ ছাড়া আরও শুনেছি অনেক জিনিস শেখান আপনারা ?"

"নিজের হাতে চাষ করতে, রান্না করতে, সুতো কাটতে, কাপড় বুনতেও শিখতে হয়। এ ছাড়া পশুপালন শিখতে হয়, গৃহশিল্পও শেখানো হয় কিছু কিছু।"

"প্রত্যেকের স্বাস্থ্য বেশ সুন্দর দেখলাম।"

"ব্যায়াম করা এখানে অবশ্যকর্তব্য—"

"পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে শুনেছি খুব কড়াকড়ি আপনাদের নাকি ?"

"নিজেরা না পড়ে কোনো বই আমরা ছেলেদের হাতে দিই না। বইটি নির্ভুল এবং আমাদের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া চাই—"

"আপনাদের আদর্শ কি ?"

"বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ তৈরি করা—"

"নাচ-গানের চর্চা নেই ?"

"না—"

"নাচ-গান কিন্তু সভ্য সমাজে শিক্ষার একটা অঙ্গ—"

"প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ করে তারা ওসব শিখতে পারে। যদি কারও মধ্যে আমরা সুকুমার-শিল্প-প্রতিভা লক্ষ্য করি, তা হলে প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হবার পর সমাজে ফিরে গেলে যাতে সে সেই বিষয়টির চর্চা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে থাকি। প্রতিষ্ঠান-জীবনে ওসব করলে চিত্তবিক্ষেপ হবার সম্ভাবনা—"

"আপনাদের প্রতিষ্ঠান কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় ?"

"না। আমাদের ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় না।"

"তারা কৃতবিদ্য হল কি না, কি করে বোঝেন ?"

"এক-একজন অধ্যাপকের অধীন পাঁচজন করে ছাত্র বারো বছর থাকে। অধ্যাপক সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে থাকেন, অধীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, কোনো ছাত্র কৃতবিদ্য হয়েছে কি না তা তিনি অনায়াসেই বোঝেন। তাঁর লিখিত অভিমতই এখানকার সার্টিফিকেট—"

"কিন্তু তা নিয়ে বাইরে চাকরি পাওয়া যাবে কি ?"

"প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার সময় শপথ করতে হয়, কখনও চাকরি করব না—"

"প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাসিক কত করে নেন ?"

"কিছু নিই না। ছাত্রদের পরিশ্রমই আমরা মূল্যস্বরূপ মনে করি—"

"বুঝলাম না ঠিক—"

"আমাদের ছাত্ররাই এখানকার সবজিবাগানের, তাঁতের, পশু-বিভাগের, ফ্যাক্টরির, শিল্পশালার কর্মী। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক বিভাগে প্রথমে কিছুদিন কাজ শিখতে হয়, তারপর কাজ করতে হয়। সুতরাং তারা তাদের পরিশ্রমের পরিবর্তেই প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষা, আহার ও বাসস্থান পায়।"

"আপনাদের আয় কি ?"

"প্রতিষ্ঠান-কর্তারা সকলেই অবিবাহিত কর্মী। তাঁরা তাঁদের সমস্ত উপার্জন এখানে দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরি প্রভৃতি থেকেও কিছু আয় হয়—"

"বাইরে থেকে চাঁদাও পান বোধ হয়—"

"না, কারও সাহায্য আমরা নিই না। নিলে দাতার সঙ্গে বাধ্যবাধকতা হবার সম্ভাবনা। টাকার জন্যে আমরা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে করা, যাতে তার নিজের উপার্জনেই নিজের খরচ চালাতে পারে। যে সব অবিবাহিত কর্মী তাঁদের সমস্ত উপার্জন দিয়ে এটার আরম্ভ করেছেন, তাঁরা চিরকাল থাকবেন না—"

"ব্রহ্মচর্য পালন নিশ্চয় এখানকার নিয়ম—"

"হ্যাঁ, ছাত্রজীবনে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্রকে বিয়ে করতে হবে—এই নিয়ম—"

"আপনাদের কোনো ছাত্রী তো দেখলাম না!"

"আমরা কো-এডুকেশনের পক্ষপাতী নই। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কো-এডুকেশন থাকলে তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীশিক্ষার আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা আলাদা প্রতিষ্ঠানে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি—"

ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ—ফ্যাক্টরির বাঁশি বাজছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ডাকছে।

দৃশ্য বদলাল।

পাগলের মতো প্রত্যহ প্রত্যেক খবরের কাগজের কর্মখালি বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়াচ্ছি। সত্য মিথ্যা নানা রকম প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করছি নিজের বিষয়ে এবং সেগুলো কপি করে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। খটখট খটখট দ্রুতবেগে টাইপ রাইটার চলছে। স্বপ্নে জাগরণে এক চিন্তা, চাকরি একটা যোগাড় করতে হবে। যোগাড় করতেই হবে যেমন করে হোক।

দৃশ্য বদলাল।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক। হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরে পিতৃবন্ধু মিস্টার হেরিংটনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, বাবাকে লুকিয়ে। তাঁর হাতে ভালো একটি চাকরি আছে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল আইরিশ টেরিয়ার একটা, লিসার কথা মনে পড়ল হঠাৎ, তারও একটা আইরিশ টেরিয়ার ছিল।...চাপরাসী এল, কার্ড দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, শেকলে বাঁধা কুকুরটা চিৎকার করতে লাগল। একটু পরে চাপরাসী ফিরল।...“আভি মোলাকাত নেহি হোগা হুজুর—”

দৃশ্য বদলাল।

সরু গলি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। বৃষ্টি পড়ছে; আশপাশের বাড়ির ছাত থেকে জল পড়ছে হুহু করে নল দিয়ে, আমার সাহেবী পোশাক কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেছে; হেমন্তবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; হেমন্ত দাশগুপ্ত একজন মাতব্বর লোক; তিনি যদি চেষ্টা করেন, সদাগরী আপিসের চাকরিটা হয়ে যায় আমার। ভয়ানক তোড়ে বৃষ্টি এল, কড়া নাড়ছি প্রাণপণে...

আলো জ্বলে উঠল।

বিচিত্র হাসির আভা ফুটে বেরুচ্ছে তার চোখ-মুখ থেকে। মেঘাবৃত চাঁদ যেন।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ কেউ কখনও চাকরি করবে না, কিন্তু তার হবু প্রতিষ্ঠাতা চাকরির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছিলেন কেন?

আমি। ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয়, ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই। আশা করেছিলাম—

সে। জানি আমি। আশা করেছিলেন যে, নিজের জন্যে দৈনিক মাত্র ছ পয়সা খরচ করে বাকীটা ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে জমাবেন।

আমি। নিশ্চয়।

সে। অর্থাৎ চুরি-নিবারণী-প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন চুরি করে!

আমি। চুরি তো চিরকাল করছি। একটা চৌর্যকে ভালো কাজে লাগাব ভেবেছিলাম, এতে ঠাট্টা করবার কিছু তো নেই।

সে। ঠাট্টা করছি না, বিস্মিত হচ্ছি।

আমি। আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই আর একবার।

সে। দিন—

আমি। আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আমার হাতে বেশি সময় নেই, আমার জীবন-কাহিনীর অনেকখানি লিখতে বাকী এখনও।

সে। আপনিও একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই।

আমি। বলুন।

সে। আপনি ডেকেছেন বলেই আমি এসেছি।

আমি। মনে পড়ছে না, ডেকেছি কি না!

সে। সব সময়ে সব জিনিস মনে পড়ে না আমাদের। যে অক্সিজেন আপনার প্রাণবায়ু, তার কথা কতটুকু মনে পড়ছে আপনার এখন? সে যদি তার আধুনিক মলিকিউলার মূর্তি পরিগ্রহ করে বৃহদাকৃতি হয়ে দেখা দেয়, চিনতে পারবেন তাকে? হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠবেন।

আমি। অক্সিজেন মলিকিউল-মূর্তি পরিগ্রহ করে আসবে!

সে। এ আল্‌ট্রা মডার্ন যুগে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি। ওসব আজগুবি চিন্তা করবার সময় নেই এখন আমার।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে কল্পনাটা করেছিলেন, তার বেশি আজগুবি এটা?

আমি। কে আপনি বলুন—

সে। পরিচয় দিতে ভয় করে।

আমি। কেন ?

সে। হঠাৎ সংযম হারালে রাত দুপুরে আপনার মতো উন্মত্ত পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠব না আমি। একটু আগে ঠাট্টার ছলে সামান্য একটু আভাস দিয়েই বুঝেছি আপনার দৌড় কতখানি।

আমি। আমার দৌড় কত, তা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে বলুন ? কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত এতবার দৌড়েছি যে, মসজিদের সম্বন্ধে মোহটা কেটে গেছে।

সে। সত্যি ? তা হলে মালতীকে সকালে অত পেড়াপীড়ি করছিলেন কেন, লুকিয়ে আজ রাত্রে আপনার কাছে আসবার জন্যে ?

আমি। কারণ, অনুভব করছিলাম, সে আমার এই অসম্ভব প্রস্তাবটার জন্যে মনে মনে ক্ষুধিত হয়ে আছে অনেক দিন থেকে।

সে। ও, ক্ষুধিতের প্রতি অনুকম্পা। তা হলে, আর কিছু নয় ? কিন্তু—

ইতস্তত করে থেমে গেল সে, দৃষ্টি আনত হল, চকিতে আড়চোখে চাইলে একবার আমার মুখের পানে, ছোট্ট একটি হাসি উঁকি দিতে লাগল অধরপ্রান্তে।

আমি। কি, বলুন ?

সে। কিছুক্ষণ আগে সঙ্কোচবশত বলতে পারি নি কথাটা। বলেছিলাম, কিন্তু ঘুরিয়ে বলেছিলাম।

আমি। কথাটা কি ?

সে। একটু আগে আমি বলেছিলাম যে, আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে ফেরবার সময় এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে, ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবার কথা মনে ছিল না আপনার। কিন্তু সত্যিই কি আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন ?

আমি। অর্থাৎ কি বলতে চান ?

সে। একাগ্রচিত্তে কি কামনা করেন নি যে, মালতী আসুক, এখনও কি প্রত্যাশা করছেন না তার আগমন? দরজা খুলে রাখাটা সত্যিই কি নিছক অন্যমনস্কতা ?

আমি। মাপ করবেন, মালতী সম্পর্কে আমি কোন কথা আলোচনা করতে চাই না কারও সঙ্গে। আপনার নিজের পরিচয়টা দিন যদি বাধা না থাকে।

সে। বললাম তো, ভয় করে বলতে।

আমি। দেখুন, স্ত্রীলোক নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি জীবনে, সুতরাং কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সত্যি যদি আপনার ভয় করত তা হলে এত রাত্রে আপনি আসতেন কি আমার কাছে এমন ভাবে? বুঝতে পারছি আমার পিছন পিছনই এসেছেন আপনি।

সে। উঃ, কি ভীষণ আত্মসংযম আপনার, প্রশংসা না করে পারলাম না।

আমি। কেন ?

সে। সব কথা জেনেও এতক্ষণ স্থির হয়ে আছেন!

আমি। কি কথা জেনে?

সে। যে, আমি একজন পথচারিণী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনাকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে আপনার পিছন পিছন এসেছি এবং এতক্ষণ ধরে আপনাকে গাঁথবার চেষ্টা করছি চার ফেলে ফেলে।

আমি। আমি ঠিক তা বলি নি।

সে। বলবেন কেন, ভাবছেন; আসল কথা যদিও ভাববার ভান করছেন এবং চমৎকারভাবে করছেন তা।

আমি। আপনার মতো মেয়েকে পথচারিণী ভাবব কোন্ সাহসে?

সে। বিপথচারিণী ভেবেছিলেন?

আমি। সবচেয়ে মুশকিল, আপনার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছুই ভাবতে পারছি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, আপনি আমার সব কথা জানেন, এমন কি আমার মনের কথাও। অথচ কিছুতেই আত্মপরিচয় দিচ্ছেন না।

সে। আপনার মতো অভিনেতা আমি দেখি নি। সব জানেন, অথচ ভান করছেন না জানার।

আমি। হেঁয়ালি নয়, স্পষ্ট করে বলুন।

সে। বিজ্ঞানের ভাষাই তো এ যুগের স্পষ্টতম ভাষা, সেই ভাষাতে বলব?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি আমি আপনার জীবনের ভিটামিন।

হাসি উপচে পড়তে লাগল চোখ ছুটি থেকে।

আমি। এতে কিছুই স্পষ্ট হল না।

সে। যদি বলি, ক্যাটালিটিক এজেন্ট ?

আমি। এ আরও অস্পষ্ট।

সে। তা হলে স্পষ্ট করি নিজেকে কি করে ? সশরীরে সামনে বসিয়ে রেখেছেন, তবুও স্পষ্ট হচ্ছে না! কবির ভাষায় বলি তাহলে—

স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল যেন দৃষ্টি। অথচ কৌতুকও উঁকি দিতে লাগল তাতে।

আমি। বলুন।

সে। যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা সামান্য একটু বদলে বলি ?

আমি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সামান্য একটু বদলালেও অসামান্য রকম ক্ষতি করা হয় তার, তা জানেন আশা করি।

সে। 'তুমি'র জায়গায় 'আমি' বসাব খালি, অর্থাৎ—

হাসলে একটু। আমি চুপ করে রইলাম।

সে। অর্থাৎ ওই ভাষাতেই ভাবছেন কিনা আপনি, বুঝতে সুবিধে হবে।

আমি। বলুন।

সে

আমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
তোমার সাধের সাধনা
তব শূন্য গগন বিহারী
তুমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
আমারে করেছ রচনা
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম। সে বলতে লাগল—

তব হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে মম
চরণ দিয়েছ রাঙিয়া
ওগো সন্ধ্যা-স্বপনবিহারী
মম অধর এঁকেছ সুধা-বিষে মিশে
তব সুখ-দুখ ভাঙিয়া
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

আমি। মনে হচ্ছে, যেন চিনেছি তোমাকে, মানে আপনাকে—

সে। তুমিই বলুন।

—চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। চুপ করে বসে রইলাম সেই নিগূঢ় অন্ধকারে। ক্রমশ যেন একটা সুর ভেসে এল, একটা নয় অনেক, বহু বিচিত্র সুরে ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠল অন্ধকার। বেণু, বীণা, বেহালা, সেতার, এস্রাজ, মৃদঙ্গ, মাদল, খঞ্জনী, পিয়ানো, ম্যাণ্ডোলিন, চেলো, গিটার, ক্ল্যাজিওলেট, শ্রুত অশ্রুত নানা যন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয়ে বাজতে লাগল কানাড়া বেহাগ জ্যাজ সোনাটা সিম্‌ফনি গজল কীর্তন। ক্রমশ একটা রামধনু ভেসে এল কোথা থেকে, সপ্ত বর্ণ বিস্তার করে দুলে দুলে বেড়াতে

লাগল সুর-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। আলোয় অন্ধকারে বর্ণে ছন্দে আবিষ্ট হয়ে এল মন। মনে হল, আমি যেন পৃথিবীর একজন বড় শিল্পী, ছন্দের বর্ণের আবেষ্টনীতে বসে স্বপ্ন দেখছি, তুলির টানে টানে রূপায়িত করব কোন্ অরূপ সুষমাকে। আচম্বিতে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল সব। নিস্তব্ধ সূচীভেদ্য অন্ধকার আবার জমাট হয়ে এল চতুর্দিকে। দেখলাম কয়লার খনির গভীর অন্ধকারে বসে কয়লা কাটছি আমি। কোথাও চাকরি পাই নি, প্রকাশ্য রাজপথে কুলিগিরি করতে পারি নি, রিক্‌শা টানতে লজ্জা হয়েছে। ভূগর্ভে আত্মগোপন করে কয়লা কাটছি, যা উপার্জন করছি তার থেকে সঞ্চয় করছি প্রত্যহ কিছু কিছু আধপেটা একবেলা খেয়ে কৃপণের মত, নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। আমি হতভাগ্য, আমি পাপী, কিন্তু আমি জানি, কোথায় গলদ, দুর্দশার মূল কোথায়। শিক্ষার অভাব। দেশের একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করে তুলতে পারি মনের মতন করে, তা হলেও সার্থক হয় আমার জীবন। দেশে মানুষ নেই, একটাও শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ সত্যসন্ধ পুরুষ নেই, সব নীচ স্বার্থপর, মুখোশ পরে অভিনয় করে চলেছে—হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হল, বিষাক্ত গ্যাসে আগুন লেগে বিস্ফোরণ হয়েছে কয়লার খাদে···ভীষণ শব্দ। সেই গগনবিদারী শব্দকে ব্যঙ্গ করে কলকণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন!

সে।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বেশবাস কবরী অসংবৃত, বিপুল হাস্যবেগ সম্বরণ করতে করতে এসে যেন দাঁড়িয়েছে।

সে। চলে যেতে পারলাম না, ফিরে আসতে হল। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি।

আমি। বলুন।

সে। আবার 'বলুন' কেন?

আমি। বল।

সে। আই. সি. এস.-পরীক্ষা-বিমুখ যে কৃতবিদ্য যুবকটি নিজেকে কয়লা-খাদের কুলি কল্পনা করে স্বদেশের দুঃখ মোচনের জন্য মনে মনে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন, তাঁর কি ধারণা, মা-বাপ স্বদেশের বাইরের লোক?

আমি। ও রকম অদ্ভুত ধারণা হতে যাবে কেন?

সে। তা হলে মা-বাপের দুঃখের কথা আগে না চিন্তা করে স্বদেশের দুঃখে বিচলিত হলেন কেন তিনি?

আমি। মা-বাবার কোনো দুঃখ ছিল না, এখনও নেই। বাবা ধনবান লোক।

সে। অর্থাভাবটাকেই একমাত্র দুঃখ বলে মনে করেন

বুঝি আপনি? সেকালের জ্ঞানতপস্বী নিঃস্ব ব্রাহ্মণরা তা হলে খুব দুঃখী ছিল বলুন!

আমি। তারা কি ছিল তা জানি না, তবে এটা ঠিক যে এ যুগের দুনিয়ায় টাকাটাই সুখ-সংগ্রহের প্রধান উপায়। টাকা না থাকলেই দুঃখ বাড়ে, আধিভৌতিক দুঃখটাও কম গ্লানিজনক নয়।

সে। এই যদি আপনার মত, তা হলে আপনার বাবার ব্যবসাতে ঢুকলেন না কেন?

আমি। চামড়ার ব্যবসা করা আমার ধাতে সইল না।

সে। যে ব্যক্তি কল্পনাতেও কয়লা-খাদে নেবে যেতে পারে, তার ধাত খুব নরম বলে তো মনে হয় না। কয়লা-খাদের তুলনায় নদীর ধারের সে ট্যানারি তো স্বর্ণপুরী।

আমি। হতে পারে। আমার কিন্তু ভালো লাগল না। আমার নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে।

সে। তা তো আছেই। কিন্তু আসল কারণ দুটি আপনি বলছেন না। বলব?

আমি। বল।

সে। প্রথম কারণ, আপনার বাবার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

আমি। ভণ্ড লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়া স্বাভাবিক। যাঁর মতে—মুরগি খেলে জাত যায়, কিন্তু গোরুর চামড়ার ব্যবসা করলে যায় না তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারি না কিছুতে।

সে। কিন্তু একে তো ভণ্ডামি বলে না। ওই তাঁর মত এবং সে মত তিনি আঁকড়ে আছেন শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। একে ভণ্ডামি বলেন? এই তো শক্তির পরিচয়।

আমি। ও রকম মাড়োয়ারী-মনোবৃত্তি বরদাস্ত করতে পারি না।

সে। অথচ টাকা চান? সোনার পাথরবাটি হয় কখনও?

আমি। তোমার মতে তাহলে টাকা রোজগার করতে গেলেই নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী হতে হবে? ম্যামন ওয়ার্শিপ করাই আমার জীবনের লক্ষ্য নয়—

সে। তা ছাড়া আর কি লক্ষ্য আছে আপনার? ভালো-ভাবে যদি ম্যামন ওয়ার্শিপটাও করতে পারতেন, তা হলেও তো একটা কাজের মতো কাজ হত। কুবের দেবতাও বিনা সাধনায় তুষ্ট হন না। যাদের নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী বলে ঠাট্টা করলেন, পারেন তাদের মতো হতে? মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে একাগ্র ব্যবসায়বুদ্ধি, দুঃখসহনশীলতা, লোকের হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা—এক কথায় তাদের চরিত্রবল কি তুচ্ছ করবার মতো?

ছুঁচটা ফুটল গায়ে।

আমি। কে বলছে, তুচ্ছ করবার মতো। কিন্তু সাধারণত মাড়োয়ারী বললে যা বোঝায়, তা হবার প্রবৃত্তি নেই। বাবা ঠিক ওই মাড়োয়ারী।

সে। মাড়োয়ারী-চরিত্রের অসৎ গুণগুলো বর্জন করে সৎ গুণগুলো নেবার তো কোন বাধা নেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসলে গেলেন না আপনি মালতীর টিটকিরির ভয়ে। যদিও মালতী ঠাট্টা করেই বলেছিল—"তুমি তো অনবরত শ্রেণীর উন্নয়নের সপক্ষে থাকবেই, তুমি নিজে যে চামারের ছেলে" ; তবু কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধেছিল আপনার বুকে। সেইজন্যেই আরও পেছিয়ে এলেন।

আমি। এ কথা খানিকটা ঠিক, কিন্তু পুরো নয়। কারণ দেশের কাজ করাই আমি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলাম, বাবার চামড়ার ব্যবসাতে যোগ দিলে তা সম্ভব হত না। তা ছাড়া, ওই ক্যাপিটালিস্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই আমার প্রধান বিরোধ, ওরাই দেশের শ্রমিকদের রক্তশোষণ করে নিজেরা পুষ্ট হচ্ছে, ওদের না জাগালে দেশের মুক্তি নেই।

সে। শ্রমিকদের জাগাবার সোনার কাঠি কি আপনি পেয়েছিলেন ?

আমি। তোমার একটা মস্ত দোষ, তুমি হেঁয়ালি বা উপমা ছাড়া কথা বলতে পার না। সোনার কাঠি মানে কি ?

সে। ভালোবাসা। ওদের কি সত্যিই আপনি আপন জনের মতন ভালোবাসেন ?

আমি। কোথাও যখন চাকরি পেলাম না, তখন ওদের

হিতার্থে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কি পরিশ্রমটা যে করেছি, তা হয়তো জান না।

সে। জানি বইকি।

দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে বুকের কাপড়টা সংবৃত করে নিলে একটু। আগে ওকে দেখে আমার যে নেশার মতো হয়েছিল, মনে হল, হঠাৎ যেন সেটা বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে, ওকে চিনেছি আমি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নিজেরই কৃতিত্বে; তবু কৌতূহল আছে এখনও। অপরিচয়জনিত কৌতূহল নয়, ওর অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করবার কৌতূহল। ওর বিস্ময়-জনক আবির্ভাব, রহস্যময় আলাপ, আমার সম্বন্ধে ওর অদ্ভুত জ্ঞান আমায় আর বিস্মিত করছে না, আনন্দিত করছে, ওকে নিবিড় ভাবে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে; মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের "স্বপ্ন" কবিতাটি, পূর্বজন্মের সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছে করছে ওকে।

দোতলায় স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যে যে পরিশ্রমটা আপনি করেছিলেন তা আমি জানি, ভালো করেই জানি। কিন্তু একটা খটকা আছে।

আমি। কি। বল?

সে। আপনি আপনার বাবার ট্যানারির শ্রমিকদের না

ক্ষেপিয়ে গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ক্ষেপাতে গেলেন কেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর যে উত্তরটা দিলাম, তাতে নিজেরই মনে বিস্ময় জাগল। ওকেও ঠকাতে চেষ্টা করছি!

আমি। কারণ গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের অবস্থা ট্যানারির কুলিদের চেয়ে ঢের খারাপ ছিল।

সে। ও!

এক ঝলক সকৌতুক হাসি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখে।

আলো নিবে গেল।

মফস্বলের ছোট একটি রেলওয়ে স্টেশন। অন্ধকার গভীর রাত্রি, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তবু চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। প্ল্যাট্‌ফর্মে তিল-ধারণের স্থান নেই। স্টেশনের বাইরে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাতে, সর্বত্র জনতা কিলবিল করছে, থিকথিক করছে। স্টেশন-মাস্টার, পুলিশ, ভলান্টিয়ার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে গোলমাল থামাতে। স্থানীয় নেতা সশঙ্কিত অবস্থায় বসে আছেন স্টেশন-মাস্টারের আপিসের এক কোণে মালা আর পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আগলে। ভিড়ে মালাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—এই তাঁর মহাচিন্তা। ফুটফুটে ন-দশ বছরের যে মেয়েটির গান গেয়ে মালা পরিয়ে দেবার কথা, সে পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে—রাত দুটো পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে নি বেচারী।

বাইরে জনতার ভিতর থেকে অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট কলরব উঠছে—বিভিন্ন স্বরের সংমিশ্রণে অর্থহীন অস্পষ্ট একটা কোলাহল ; ননে হচ্ছে, নিবিড় অন্ধকারে ভারতবর্ষের ক্ষুধিত পীড়িত আত্মাই যেন বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে চলেছে।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে হুইস্‌ল বেজে উঠল। ট্রেন আসছে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন স্টেশন-মাস্টার নিজের আপিসে। স্থানীয় নেতাকে বললেন, “এখুনি মেসেজ পেলুম ডি. এস.-এর, পার্‌-মিশন দিলে না মশাই। ট্রেন দু মিনিটের বেশি দাঁড় করাতে পারব না, গান-টান হবে না, মালাটাই পরিয়ে দেবেন। ট্রেন এল,

আপনার সব ঠিক করে নিন। চাকরি, বুঝলেন মশাই, চাকরি—” বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ফুলের মালাটা সাবধানে নিয়ে মেয়েটিকে জাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্থানীয় নেতা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে।

“জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়, জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—” চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন করে উঠল জনতা। শ্রমিক-নেতা প্রেমসিন্ধু দত্ত প্রথম শ্রেণীতে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন, অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, প্রতি স্টেশনে এ রকম করলে আর কাঁহাতক পারা যায়! ঘুম আর হবে না দেখছি। কাল সমস্ত দিন বক্তৃতা আছে, আর পারা যায় না—

জানালা খুলে মুণ্ডটা বাড়ালেন।

“জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—”

স্থানীয় নেতা সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, মেয়েটি এগিয়ে এল মাল্য-হস্তে, প্রেমসিন্ধু দত্ত গলা বাড়িয়ে দিলেন, পেট্রোম্যাক্সের তীব্র আলোকে ক্লিক করে একটা শব্দ হল ফোটো নেওয়ার, মাল্য-ভূষিত প্রেমসিন্ধু দত্তকে দেখতে পেয়ে জনতা আর একবার চীৎকার করে উঠল—“জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়”। গার্ডের হুইস্‌ল বাজল। নেবে পড়ুন, নেবে পড়ুন—“স্টেশন-মাস্টারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণামান্তে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন স্থানীয় নেতা, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর একবার জয়ধ্বনি উঠল—“জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—”

দৃশ্য বদলাল।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় বসে আছে শ্রমিকের দল—ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকের দল। কাতারে কাতারে বসে আছে উন্মুখ প্রত্যাশায়। একটা সমুদ্র যেন, কিন্তু নিস্তব্ধ সমুদ্র, একটি তরঙ্গ উঠছে না, রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে সবাই। একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে বায়ুর স্তরে স্তরে। প্রেমসিন্ধু দত্ত বক্তৃতা করছেন আবেগময়ী ভাষায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, ঝুলে পড়েছে খদ্দরী আস্তিন উৎক্ষিপ্ত বাহুমূলে, প্রাণের জ্বালা জ্বলন্ত বাণীমূর্তি লাভ করছে প্রতি মুহূর্তে উদারা মুদারা তারায়, দরদর করে ঘাম পড়ছে, অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল, অবাক হয়ে শুনছে সবাই, একটা তীব্র সুরা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে প্রত্যেকের শিরায় উপশিরায়, ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকদের দুঃখের অবসান বুঝি হয় হয়…।

প্রেমসিন্ধু দত্ত থামলেন।

সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠল করতালিরবে, আনন্দের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল যেন। থামতে চায় না।

সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে কিন্তু স্টোভের শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল—সোঁ-সোঁ সোঁ-সোঁ…।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। আপনার এ স্বপ্নটা সফল হতে পারত, হল না কেবল নিজের দোষে।

আমি। কেন?

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্যাক্‌ট করলেই পারতেন, অন্য জেলায় শ্রমিক-আন্দোলন করবার জন্যে বেশ মোটা টাকা দিতে চাইছিলেন তিনি, অনায়াসে আপনি একজন নেতা হতে পারতেন।

আমি। ও রকম অসম্মানজনক প্যাক্‌ট করা যায় নাকি কখনো?

সে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত অসম্মানজনক কাজই তো করলেন জীবনে, এটা করলে কি আর এমন বিশেষ ক্ষতি হত! গৌরীশঙ্করবাবুর কেবল একটি শর্ত ছিল, তাঁর মিলে হাত দিতে পারবেন না আপনি এবং অপরে যদি কেউ হাত দিতে চায়, তাকে বাধা দেবেন।

আমি। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের স্বার্থ বিদলিত করবার কোনো অধিকার নেই আমার।

সে। পরের স্বার্থ তো কত বার বিদলিত করেছেন নিজের

সুখের জন্য! ওই কুলিদের বেলাতেই হঠাৎ ধর্মভাব জেগে ওঠবার মানে কি?

আমি। কার স্বার্থ বিদলিত করেছি?

সে। আপনার বাবার, মালতীর বাবার।

আমি। ওসব নিতান্ত ব্যক্তিগত জিনিস, ওসবের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

সে। ও, চলে না বুঝি!

হাসি চিকমিক করতে লাগল তার চোখে।

আমি। ব্যক্তি আর সমাজ এক নয়।

সে। বুঝলাম না।

আমি। সমাজ-জীবনে স্বার্থ বলিদান দেওয়াতে যে পৌরুষ, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থ আঁকড়ে ধরাতে ঠিক সেই পৌরুষ। আমার ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়েই আমি, তুচ্ছ কারণে প্রতি পদে তা বিসর্জন দিতে গেলে নিজেকেই বিসর্জন দিতে হয়। তা হলে আর বেঁচে লাভ কি! বাঁচাটাই উদ্দেশ্য। বৃহত্তর সমাজের জন্যে আত্মবিসর্জন করলে অমরত্ব লাভ করা যায়, ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে করলে কিছুই লাভ হয় না, এক আত্মগ্লানি ছাড়া।

সে। বাবার সঙ্গে মতে মেলে নি তাই তাঁর সঙ্গে বিরোধ, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু মালতীর বাবার সঙ্গে?

আমি। মালতীর বাবার স্বার্থ আমি নষ্ট হতে দিতাম না—কিন্তু, থাক ও আলোচনা।

সে। মুখে বলছেন 'থাক', কিন্তু মনে মনে ওই আলোচনাই করছেন সারাক্ষণ। জিনিসটা মর্মমূলে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, তবু তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করছে ব্যথা সত্ত্বেও।

সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে উঠল তার।

আলোটা নিবে গেল।

দুর্জয় শীত পড়েছে। তুষারপাত হচ্ছে। ল্যাচ কী ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। একটু আগেই যে মেয়েটির সঙ্গে নাচছিলাম, তার হাব-ভাব চলন-বলনে একটু আকৃষ্ট হয়েছিলাম যদিও কিন্তু মুগ্ধ হই নি। বরং ভাবছিলাম, ভাগ্যে আমাদের দেশে ঠিক এই জাতীয় মেয়ের আবির্ভাব হয় নি এখনও; ভাবছিলাম মালতীর কথা , ভাবছিলাম, সেদিন ইণ্ডিয়ান ওম্যানহুড নিয়ে বক্তৃতা করলে যে ছোকরা সায়েবটি, সে মালতীকে দেখে নি, সে দেখেছে রাস্তার ভিখারিণী অথবা বেশ্যালয়ের নর্তকীকে, কিংবা বড় জোর ভারী ভারী রুপোর গয়না-পরা, নাকে বেসর দোলানো নিম্নশ্রেণীর কোন বধূকে, মালতীকে দেখে নি। রেন-কোট ওভার-কোট খুলে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলাম ফায়ার-প্লেসের দিকে, এখনও আগুন আছে দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ল, টেবিলের উপর একখানা চিঠি রয়েছে, ল্যাণ্ডলেডি রেখে গেছে বোধ হয়, আজ যে 'মেল ডে' তা মনেই ছিল না। এ কি, এ যে মালতীরই চিঠি দেখছি। আরাম করে বসে পড়তে হবে, ঈজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম ভালো করে রাগটাকে পায়ের উপর টেনে নিয়ে। পড়তে লাগলাম চিঠিটা—

ভাই প্রেম দত্ত,

দোহাই তোমার, সত্যি সত্যি যেন আই. সি. এস. পরীক্ষাটি পাস করে ফেলো না, তা হলে বাবা নির্ঘাত তোমার সঙ্গেই

আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বাবা টাকা দিয়ে জীবনের অনেক শখ কিনেছেন, এখন টাকা দিয়ে আই. সি. এস. জামাই কেনবার শখ জেগেছে তাঁর। তাই তোমাকে এত খরচ করে বিলেত পাঠিয়েছেন। তুমিও দিব্যি চলে গেলে নিজের বাপ-মার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে। এটা আমার একটু ভালো লাগে নি। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি লোকটাকেই আমার মোটে পছন্দ হয় নি, তোমাকে ভালোবাসি নি একটুও, বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না। তোমার বিলেত যাওয়ার আগ্রহ দেখে, আমি বাবা-মাকে কিছু বলি নি। বরং ভান করেছিলাম যে, তোমাকে আমার ভালোই লেগেছে। ভেবেছিলাম, বাবার প্রচুর টাকা আছে, তার থেকে কিছু খসিয়ে যদি কোনো ছেলের বিলেত যাওয়া ঘটে, আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু? সাহায্যই বরং করা উচিত, বাবা বিনা স্বার্থে তো কাউকে পাঠাবেন না। কিন্তু এখন আর সত্যি কথাটা গোপন রাখা উচিত নয়, তোমাকে বিয়ে করব না আমি। ভালোবেসেছি তোমার বন্ধু রমেশকে, তাকেই বিয়ে করব। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আই. সি. এস. পাস করে ফেল, বাবাকে ঠেকানো শক্ত হবে। দোহাই তোমার, ও কাজটি কোরো না। বাবার টাকায় তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার যা খুশি হও, কেবল আই. সি. এস.টি হয়ো না।

আশা করি, এ প্রস্তাবে তোমার তরফ থেকেও ক্ষোভের

কোনো কারণ ঘটবে না। কারণ, আমার মতন একজন অতি-সাধারণ মেয়ে যে তোমার মতো ছেলের মনোহরণ করতে পেরেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। ও দেশে তোমার উপযুক্ত মেয়ে আছে, হয়তো এতদিন ভাবও হয়ে গেছে কারও সঙ্গে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না ; এবং দোহাই তোমার, আর যা-ই কর ভণ্ডামি কোরো না। ইতি—

মালতী

সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর ক্রমশ জাগল ডাক্তার রবিনসনের মুখখানা, রিসার্চ-স্কলার ডাক্তার রবিনসন। ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে আমাকে। পট করে ছুঁচটা ফুটল গায়ে—

আলো জ্বলে উঠল।

সে। মালতীর কথা পরে ভাববেন, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন।

আমি। কি বল ?

সে। শ্রমিকদের কষ্টে কি সত্যি দুঃখ হয় আপনার ?

আমি। হয় বইকি। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, শ্রমিকদের যতক্ষণ না আর্থিক উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা শিক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, ততক্ষণ এদেশের মুক্তি নেই।

সে। এটা আপনার ব্যক্তিগত মত, না সামাজিক মত ?

আমি। তার মানে ?

সে। মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আপনার আচরণ। আপনি গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ধর্মঘট করিয়ে তাদের জন্য যে সব জিনিস দাবি করেছিলেন, আপনি নিজে তাদের সে সব দাবি গ্রাহ্য করেন কি ? আপনি কি আপনার চাকরের ওই দাবি অনুসারে মাইনে দেন, আপনার উনুন ধরাতে গিয়ে সে যদি পুড়ে যায়, কম্‌পেন্‌সেশন দেন তাকে, অসুখে পড়লে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করান তার ? তার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ? নিয়মিত ছুটি দেন ?

সেদিন যে আপনার চাকরটা আসে নি, তার একমাত্র কারণ তার জ্বর হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে না আসাতে আপনার জুতো বুরুশ করা হয় নি এবং যেহেতু কম চকচকে জুতো পরে মালতীদের বাড়ি যেতে আপনার লজ্জা করেছিল, সেই হেতু বেচারাকে এক কথায় আপনি ছাড়িয়ে দিলেন তার শোচনীয় দুরবস্থা জেনেও। এই একই ব্যক্তি কি করে মিলের শ্রমিক-দের দুঃখে বিগলিত হয় বুঝি না।

আমি। আমার আর্থিক অবস্থা আর গৌরীশঙ্করবাবুর আর্থিক অবস্থা এক নয়।

সে। নিশ্চয়ই নয়, অনেক তফাত। আপনি একজন বেকার হতভাগা, আর তিনি নিজের চেষ্টায় চার-চারটে মিল স্থাপন করেছেন। দেশের বহু নিরন্ন লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছেন, অর্থোপার্জনের একটা স্বাধীন ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, উপার্জিত অর্থ দিয়ে দেশের অনেক সৎকার্যও করেছেন। কংগ্রেসের লোক, গবর্মেণ্টের লোক সবাই খাতির করে তাঁকে সেজন্য। আপনি সে সব কিছুই করেন নি, আপনার একমাত্র চেষ্টা, কিসে তাঁর ব্যবসা পণ্ড হয়, কিসে তিনি জব্দ হন।

আমি। শ্রমিকদের উন্নতি করলে ব্যবসা পণ্ড হয় না, ব্যবসার উন্নতি হয়।

সে। শ্রমিকদের মারফত আপনি দাবির যে ফর্দটা পেশ করিয়েছিলেন, তা মেনে নিলে গৌরীশঙ্করবাবুর মাসিক বিশ

হাজার টাকা খরচ বেড়ে যায়। এই প্রতিযোগিতার দিনে বিশ হাজার টাকা খরচ বাড়ালে তাঁর ব্যবসা টিকতে পারে? আপনি নিজে মাসে পাঁচ টাকা খরচ করে আপনার দুঃস্থ চাকরের দুঃখ দূর করতে অপারগ, আপনি বক্তৃতা করে অপরকে বিশ হাজার টাকা খরচ করবার ফরমাশ দেন!

আমি। গৌরীশঙ্করবাবু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। যে শ্রমিকদের পেশীর শক্তি নিঙড়ে তিনি ওই টাকা উপার্জন করেছেন, সেই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সেই উপার্জনের ন্যায্য অংশীদার হবার।

সে। হয়তো আছে। কিন্তু তা নিয়ে বোঝাপড়া করুক গৌরীশঙ্করবাবু আর তাঁর শ্রমিকরা, আপনার স্থান কোথা এর মধ্যে? আপনি ওপর-পড়া হয়ে আসেন কি হিসেবে?

আমি। এর উত্তর কবি দিয়েছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—

সে। সে ভাষা দিতেই বা পারলেন কই? গৌরীশঙ্কর-বাবুর এক চালেই তো মাত হয়ে গেলেন।

আমি। হ্যাঁ, রমেশের জন্যেই শেষকালে—

সে। মালতীর জন্যে বলুন।

একটা ক্ষুরধার হাসি চকমক করে উঠল চোখে মুখে। আলো নিবে গেল।

শ্রমিক-সঙ্ঘের · আগামী অধিবেশনের আয়োজনকল্পে বেরুচ্ছিলাম। তাতে গৌরীশঙ্কর রায়কে সংঘের তরফ থেকে চরমপত্র দেবার যে আয়োজন হচ্ছিল, আমিই তার একমাত্র নেতা,—এ শহরে ধনী গৌরীশঙ্করবাবুর বিরুদ্ধতা করবার সাহস আর কারও নেই। বেরুচ্ছিলাম, এমন সময় ফোন এল—মালতীর ফোন—"বড় জরুরী দরকার, একবার এস।" মালতীর আমাকে দরকার? আমাকে? ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ভাবলাম এলোমেলো কত কি! তারপর সহসা মনে হল, বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যেতেই যখন হবে অবিলম্বে যাওয়াই ভালো।

এসেছি। এসেই মালতীর সঙ্গে দেখা হয় নি, হয়েছিল তারিণীবাবু আর লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী দুজনেই পেন্‌শনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। চাকরি নেই, ভদ্রভাবে অবসর বিনোদন করবার মত মানসিক সংস্কৃতি নেই, শরীরও অপটু নয় যে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটবে, তাই এঁরা পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়ান হিতৈষীর ছদ্মবেশে। প্রত্যেকের বৈঠকখানায় এঁদের অবাধ গতিবিধি। প্রত্যেকের মনের খবর, দেহের খবর, হাঁড়ির খবর, চাকরির খবর, মকদ্দমার খবর, চিকিৎসার খবর—সমস্ত খবর এঁরা রাখেন এবং তাই

নাড়াচাড়া করে সময় কাটান। কথা চালাচালি করে মজাও দেখেন মাঝে মাঝে। এই নিরীহ বুড়ো দুটিকে শত্রু বলে চিনতে দেরি লাগে এবং চেনবার পরও তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ঘুরিয়ে বললে এঁরা না-বোঝার ভান করেন, বুঝলেও গায়ে মাখতে চান না। সোজাসুজি কটু কথা বলা যায় না, কারণ মফস্বলে পক্ককেশ ব্যক্তি মাত্রেই বিজ্ঞ, সুতরাং পূজনীয়। আমি যদিও এঁদের অপমান করি নি কোনোদিন, কিন্তু আমাকে এঁরা ভয় করেন, এড়িয়ে চলেন। মালতীর সম্বন্ধে শহরে নানারকম গুজব প্রচলিত আছে, তারই আকর্ষণে এঁরা আসেন এখানে রমেশের রিসার্চ কতদূর এগোল এই খবর নেবার অজুহাতে। টুকরো-টাকরা যা দু-একটি খবর সংগ্রহ করতে পারেন—রিসার্চ নয়, মালতীর সম্বন্ধে—তারই উপর রঙ চড়িয়ে আনন্দলাভ করেন বোধ হয় অন্য কারও বৈঠকখানায় বসে এবং অন্য কারও খরচায় তামাক টানতে টানতে। আমাকে হঠাৎ প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দুজনেই, মনস্কামনা সিদ্ধ হল সম্ভবত, আমার এখানে আসাটা নিয়েই বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটবে।

তারিণীবাবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললেন, "প্রেমসিন্ধু যে, তারপর খবর সব ভালো? তোমার পিতা কেমন আছেন?"

"ভালো—"

সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্ষুণ্ণ হলেন বোধ হয় তিনি। জগৎ লাহিড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "চল হে, চাটুজ্জেদের মেয়েটি কেমন আছে খবর নিয়ে আসি। রমেশের ফিরতে দেরি হবে আজ দেখছি, রিসার্চের খবরটা আর নেওয়া হল না আজ।"

"চল—"

"সিবিল সার্জেন ব্যাটা মারবে দেখছি মেয়েটাকে। চাটুজ্জেকে বলছি কবরেজি করাও, কিন্তু কিছুতে শুনবে না ও।"

"চল, আর একবার বোঝাই গিয়ে—"

"তাই চল—"

চলে গেলেন দুজনে।

আমি সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতী বাথরুমে ছিল। আমার সাড়া পেয়ে বাথরুম থেকেই চেঁচিয়ে বললে, "বোসো একটু, আমার হয়ে গেছে—"

গদি-আঁটা স্প্রিঙের চেয়ারটায় বসলাম। এতক্ষণ মনে পড়ে নি, কিন্তু এইবার মনে পড়ল, এটা আষাঢ় মাস। মেঘ-মেদুর আষাঢ়-অপরাহ্ন! অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া ভাব। হলদে দেওয়ালগুলোতে নীলাঞ্জনের আবেশ লেগেছে, পিতলের টবে বন্দী বামন তালগাছটা যেন স্বপ্ন দেখছে মেঘমল্লারের। মালতী ঠিক পাশের ঘরেই স্নান করছে, সাবান মাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।...রমেশকে মনে পড়ল, বেঢপ চেহারা, মনে হয় শরীরে কোনো হাড় নেই, সর্বাঙ্গ থলথল করছে। তবু বিলেতে অনেক

মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল শুনেছি, মালতীরও লাভ-ম্যারেজ। রমেশের চেহারা যেমনই হোক, প্রতিভা আছে এবং সে প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার চোখমুখ দিয়ে। কোন একটা জিনিস নিয়ে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে ওর। নীরস কেমিস্ট্রিতে কি রস পেয়েছে ওই জানে, কেমিস্ট্রিই ধ্যান-জ্ঞান, ওইতেই ডুবে আছে। বাড়িতেও শোবার ঘরের পাশে ছোট খাটো ল্যাবরেটরি করেছে একটা। বিলেতেই আমার সঙ্গে ভাব হয়েছিল, আমি বিলেতে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই ও দেশে ফেরে। তার পরের ডাকেই মালতীর চিঠি পাই।

বাথরুমের কপাট ঠেলে মালতী বেরিয়ে এল। ঠিক যে শাড়িটি পরলে ওকে সবচেয়ে বেশি মানায়, সেই শাড়িটিই পরেছে—টকটকে লালপেড়ে কমলা-রঙের শাড়ি। সুন্দরী, যুবতী বা তন্বী বলতে যা বোঝায়, মালতী ঠিক তা নয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, মাজা-মাজা রঙ, একটু মোটাসোটা গোছের। দেখবামাত্রই মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো চেহারা নয়। কিন্তু ওর সঙ্গে কিছুদিন মিশলে, ওর দৃষ্টির, ওর হাসির বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর অর্থ বুঝতে পারলে, ওর অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পেলে, ওর আর একটা যে রূপ চোখে পড়ে, তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হলেও অনন্যসাধারণ।

দেখা হলে সাধারণত লোকে হাসে, মালতীও হাসে, আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলাম। আজ কিন্তু আমাকে দেখেই মালতী

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকে অপাঙ্গে আমার পানে একবার চেয়ে একটি ছোট মোড়া টেনে বসল একটু দূরে। তারপর যা বললে, তা এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। "এই যদি তোমার মনে ছিল তা হলে সেটা খোলাখুলি বললেই পারতে, আমি নিজেই চলে যেতাম এখান থেকে। ওঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি করার কোনো দরকার ছিল না।"

আমি কিছু বলবার আগেই বাঘিনীর মতো দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো, সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অদৃশ্য অগ্নিশিখা লকলক করে উঠল যেন। "আমি যদি না যাই, সাধ্য আছে তোমার আমাকে এখান থেকে তাড়াবার? আমি কারও চাকর নই, আমার বাপের বাড়ি এখানে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকবারও সঙ্গতি আছে আমার নিজের। তোমার বন্ধুর টাকার তোয়াক্কা করি না আমি—"

"কি বলছ বুঝতে পারছি না—"

"নিজের প্রয়োজনমত কোনো জিনিস বুঝতে না পারাটাই তো তোমার বিশেষত্ব। বিলেতে তোমাকে যে চিঠিটা লিখে-ছিলাম সেটাও তুমি বুঝতে না পারার ভান করেছ। তিন মাস থেকে যে আমাদের বাড়িতে আসছ না, তাও একটা ভান তোমার—একটা পোজ। পাছে আমার সুনামে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী কলঙ্ক রটায়—এই ভয়ে আস না।

যেন কত বড় হিতৈষী আমার। তুমি কি মনে কর, তোমার ভান নঝতে পারি না আমি ?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, কারণ জানি, উত্তর দিলে উত্তাপ বেড়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরল আবার এবং আমার দিকে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুড়িয়ে দেখি, একখানা চিঠি। প্রফেসার চক্রবর্তী রমেশকে ইংরেজীতে লিখেছেন। তার বাংলা মর্মার্থ এই।—"রমেশবাবু, গোপনে আপনাকে একটা খবর জানাচ্ছি। আগামী একুশে তারিখে কলেজ-কমিটির যে মীটিং হবে, তাতে আপনাকে পার্মানেণ্ট করা হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা হবে। আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু গৌরীশঙ্করবাবু প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ি গিয়ে এই কথা বলে এসেছেন—প্রেমসিন্ধু দত্তের মতো ডেঞ্জারাস ক্যারাক্টারের লোকের সঙ্গে যার অত মাখামাখি, তাকে কিছুতেই পার্মানেণ্ট করা চলবে না। আপনি জানেন নিশ্চয়, প্রেমসিন্ধুবাবুর প্ররোচনাতেই গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিরা ধর্মঘট করেছিল। শোনা যাচ্ছে, প্রেমসিন্ধু দু-চার দিনের মধ্যেই নাকি কুলিদের তরফ থেকে একটা আল্টিমেটাম পাঠাবেন গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করে প্রেমসিন্ধুবাবুকে এ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন, তা হলেই গৌরীশঙ্করবাবুর মত বদলাতে

পারে হয়তো, অর্থাৎ তা হলেই আপনার চাকরিতে পাকা হবার আশা আছে, নতুবা নেই। কারণ, জানেনই তো, গৌরীশঙ্করবাবু কলেজে একলাখ টাকা দান করেছেন, তাঁর কথা কোনো মেম্বারই ঠেলতে পারবে না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন, যদি প্রেমসিন্ধুবাবুকে রাজী করাতে পারেন। আজকাল বাজারে চাকরি গেলে যে কি অবস্থা হয়, তা আশা করি প্রেমসিন্ধুবাবু বুঝবেন, যতদূর জানি, তিনি সহৃদয় লোক...”

চিঠিখানা হাতে করে বিমূঢ়ের মতো বসে রইলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, আষাঢ়ের নব-জলধর স্তূপীকৃত হচ্ছে ঈশান কোণটায়, মাঠের ওপাশে পুষ্পিত কদমগাছটা নুয়ে নুয়ে পড়ছে পুবে-হাওয়ার বেগে। মালতী হঠাৎ এল আবার। হাতে একটা রুপোর ট্রে, ট্রের উপর কাচের পান-পাত্র, তাতে টলমল করছে রঙিন সুরা। হুইস্কি।

“তোমার আগামী জন্মদিনে এইটে উপহার দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি যা আয়োজন করছ, তাতে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। এখনই নাও, অবশ্য নিতে যদি আপত্তি না থাকে।” বাঁ হাত দিয়ে একটা তেপায়া আমার সামনে টেনে এনে তার উপর ট্রেটা রাখলে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

“হুইস্কিতে কিছু মেশানো হয় নি, সোডা আনতে পাঠিয়েছি—”

চিঠির সম্বন্ধে আলোচনা কি ভাবে করব ভাবছি, এমন সময় সে নিজেই বললে, "তোমার বন্ধুটিও কম আশ্চর্য লোক নন। চিঠিখানার কথা আমাকে বলেনই নি। আমি ল্যাব-রেটরি-ঘরটায় ঢুকে হঠাৎ ওটা আবিষ্কার করলাম একটু আগে, টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক চাপা ছিল—"

দুজনেই চুপ করে রইলাম। একটু পরে মালতীই আবার কথা বললে, "আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য, তুমি মনে কোরো না যে, উনি আমার মারফত তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। তা জানাচ্ছেন না, আমি নিজের দিক থেকেও কিছু বলছি না, কারণ জানি, তোমাকে কিছু বলা বৃথা, তুমি যা করবার ঠিকই করবে, মাঝ থেকে পোজ করবে একটা নতুন রকম—"

আমি ওর দিকে চেয়ে ছিলাম না, আমি চেয়ে ছিলাম খোলা জানালা দিয়ে দূর ঈশান কোণে, যেখানে পুঞ্জীভূত মেঘমালা কৃষ্ণতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ, দেখেছিলাম বায়ুবিত্রস্ত কদম গাছটাকে, কিন্তু মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছিলাম, ওর জ্বলন্ত দৃষ্টিটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললাম, "দেশলাই দাও তো একটা—"

পাশের টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেশলাই বার করে দিলে, ভাবলে, সিগারেট ধরাব বুঝি। গৌরীশঙ্করবাবুকে দেবার

জন্যে যে চরমপত্রখানা রচনা করেছিলাম, সেখানা পকেটেই ছিল। সেটা বার করে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বেশ করে ভিজিয়ে নিলাম।

"কি করছ? কি ওটা?"

"শ্রমিক-সঙ্ঘের আল্‌টিমেটাম—"

বাকী হুইস্কিটা এক নিশ্বাসে পান করে ফেললাম নির্জলাই। কাগজখানা ট্রের উপর রেখে ধরিয়ে দিলাম আগুন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুঁকড়ে কালো হয়ে উঠল, তারপর দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল। মালতী নিস্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখলে সব। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার চোখের আগুনও নিবে গেছে, পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাগিনীর মতো তর্জন করে উঠল, "I hate you, I hate you, I hate you!" দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। মালতীর চেয়ে মিনতি মেয়েটি কি ঠাণ্ডা নয়? নিরীহ ভালোমানুষ বেচারী, মুখে কথাটি নেই।

আমি। মালতীর সঙ্গে মিনতির তুলনা কোরো না, তুলনা হয় না।

সে। তুলনা করছি না, কে কি রকম তাই শুধু বলছি। মালতী মুখরা, মিনতি নীরব।

আমি। আর একটু সরব হলে ক্ষতি ছিল না।

চুপ করে রইলাম দুজনেই খানিকক্ষণ।

স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যাঁর মাথায় ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এসেছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠানে যিনি নীরবতাকেই উচ্চ আসন দিয়েছিলেন, তাঁর মুখে এ কথা শুনে একটু বিস্ময়বোধ করছি।

আমি। ছাত্রের আচরণে যেটা শোভন, প্রিয়ার আচরণে সেটা শোভন নাও হতে পারে।

সে। মিনতিকে প্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন তা হলে!

সমস্ত মুখখানা হঠাৎ হাসিতে ভরে উঠল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল, আবার স্টোভের আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যে মেয়ে খুব বকবক করতে পারে তাকেই আপনার পছন্দ যদি, তা হলে বিলেত যাবার মুখে মার্‌সেল শহরে নেবে মাদাম ডি'কস্টার ওখানে যে মেয়েটির সঙ্গে রাত্রি-বাস করেছিলেন তার ওপর তত প্রসন্ন হতে পারেন নি কেন; তার খিলখিল হাসি আর গলগল বকুনির তো অন্ত ছিল না।

আমি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় আমরা মেয়েদের মধ্যে কি চাই।

সে। বোঝা অসম্ভব হত না, যদি চাহিদাটা রোজ রোজ না বদলাত।

আমি। কি রকম?

সে। প্রথম যৌবনের কথা ভেবে দেখুন। লাজনম্রা তন্বী কিশোরী মূর্তিই তখন আপনার স্বপ্নকে মধুর করে তুলত। এই মিনতিই যদি ঠিক দশ বছর আগে আসত, তা হলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এখন কিন্তু ত্রিশ বছরের মুখরা মালতীই আপনাকে উতলা করে তুলেছে, মিনতিকে নেহাত বিস্বাদ ঠেকছে এবার।

আমি। একটু ভুল হল বোধ হয়। হিসেবটা ঠিক বয়সের নয়, গুণের এবং রুচির। আমি সুক্তো ভালোবাসি না, ঝাল-ঝাল মাংসই আমার প্রিয় খাদ্য। বিষধর সাপ যখন ফণা তুলে গ্রীবাভঙ্গীসহকারে দুলতে থাকে, আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; কিন্তু কেঁচো দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

সে। সত্যি গা ঘিনঘিন করে? কালই তো আপনি মিনতির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন!

আমি। ঠিক মিনতির দিকে নয়, মিনতির নবোন্মেষিত যৌবনের দিকে। মিনতিকে বাদ দিয়ে যদি তার নবোন্মেষিত যৌবনটাকে বিয়ে করা চলত, আমি বিয়ে করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু বাঙালী মেয়ের দেহে যৌবন তো বেশি দিন থাকবে না, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে, পড়ে থাকবে ওই হাঁদা মিনতি, যে একটা রসিকতা বোঝে না, ধমকালে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্না-ঘর ভাঁড়ারঘরের বাইরে যার অস্তিত্ব নেই—ওই পড়ে থাকবে। ওকে নিয়ে কি করব আমি সারাজীবন?

সে। আপনার মাকে আপনার কেমন লাগে?

আমি। খুব ভালো লাগে।

সে। সত্যি? খুব আশ্চর্য তো! যতদূর জানি, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের বাইরে তাঁরও তো অস্তিত্ব নেই!

আমি। কিন্তু তিনি মা।

সে। অর্থাৎ তিনি আপনার সব রকম উপদ্রব সহ্য করেন। নয়?

আলো নিবে গেল।

নোংরা বস্তি। খুব ছোট একটা খোলার ঘর, বর্ষাকালে চাল দিয়ে জল পড়ে, অন্যকালে আকাশ দেখা যায়, পাশেই পচা নালা দুর্গন্ধ বিকিরণ করছে। অসংখ্য মশা, চীৎকার করছে মাতাল, আর্তনাদ করছে প্রহৃত নারী, কাঁদছে পীড়িত শিশু। তার সঙ্গে মিশছে পেঁয়াজ-ভাজার গন্ধ, রামায়ণ-পাঠ, বেশ্যার সঙ্গীত, উননের ধোঁয়া, পুলিশের হুমকি। খোলার ঘরের এক কোণে দড়ির একখানি খাটিয়া, খাটিয়ার সামনে উপর্যুপরি সাজানো দুটি কেরোসিন কাঠের বাক্স টেবিলের অভাব পূর্ণ করছে। তার একধারে মিটমিট করে জ্বলছে কালিঝুলি-মাখা সস্তা লণ্ঠন একটা, আর একধারে রয়েছে আধখানা-খাওয়া শুকনো একটা পাঁউরুটি, মাঝখানে তন্ময় হয়ে বসে লিখে চলেছে একজন, মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল, চোখে শিল্পীর স্বপ্ন।

ব্যাল্‌জাক নয়···আমি।

সাহিত্য-সেবা করছি।

দেশকে জাগাতে হবে।

দৃশ্য বদলাল।

অভিজাত পল্লী। চমৎকার সুসজ্জিত একটি কক্ষ, পাশেই সুন্দর বাগান সৌরভ বিকিরণ করছে, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, চীৎকার করছে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর একটা, মোটরটা আর্তনাদ

করছে গ্যারেজে, কাঁদছে ক্ল্যারিঅনেট পাশের পাশের বাড়ির জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে, বাজছে তাতে 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে', তার সঙ্গে মিশছে বিলিতি এসেন্সের গন্ধ, এজরা পাউণ্ডের কাব্য-পাঠ, রেডিওর সঙ্গীত, সিগারেটের ধোঁয়া, সম্পাদকের বকুনি। কক্ষটির একধারে সোফা সেটি, আর এক ধারে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রেক্সিন দিয়ে মোড়া। তার ওপর আছে সুদৃশ্য দুটি কাচের দোয়াত, এক টুকরো দামী মার্বেলের ওপর বসানো, চমৎকার কাগজ-চাপা গোটা দুই, চায়ের পেয়ালা, কয়েকটা অ্যাশ-ট্রে। টেবিলে পা তুলে সাহিত্য আলোচনা করছি, আশেপাশে এসে জুটেছে তরুণ সাহিত্যিকেরা—বুভুক্ষু, তিক্ত-চিত্ত, সন্দিগ্ধমনা, অসমর্থ, মুখে বিদ্রোহপন্থী। মাসিক-পত্রিকার আপিস। আমি সম্পাদক। স্বপ্ন দেখছি,—চোখের উপর ভাসছে রবীন্দ্রনাথ, উত্তরায়ণ, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি, অটোগ্রাফ, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, দেশসেবা, নোবেল প্রাইজ…

আলো জ্বলে উঠল।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের শিখা মালতীর এক ফুৎকারেই নিবে গেল?

আমি। নিজেও ভেবে দেখলাম, আমি ঠিক ওর উপযুক্ত নই। আমি রাজনৈতিক নই, আমি সাহিত্যিক, আজীবন সাহিত্য-চর্চা ছাড়া আর কিছু করি নি।

সে। কিন্তু ব্যাল্‌জাক ডিকেন্সের মতো কৃচ্ছ্রসাধন করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া করে বসলেন যে?

আমি। মা লুকিয়ে যখন কিছু টাকা দিলেন, তখন কৃচ্ছ্রসাধন করবার দরকার হল না। সাহিত্যিকেরা স্বভাবত বিলাসপ্রবণ, বিলাসের আবেষ্টনীতেই তাদের কল্পনা স্ফূর্ত হয়। শখ করে কেউ কৃচ্ছ্র সাধন করে না, করে দায়ে পড়ে। আমার দরকার হয় নি।

সে। কিন্তু তবু আপনার কল্পনা স্ফূর্ত হল না কেন?

আমি। আমার কল্পনা স্ফূর্ত হয়েছিল কিন্তু একা একটা কাগজ চালানো যায় না, একজনের লেখা পড়ে পাঠক-পাঠিকার পিপাসা মেটে না।

সে। কিন্তু আপনার কাগজে যৌন-পিপাসা ছাড়া আর কোনো পিপাসার খোরাক ছিল না।

আমি। আমার দলে যে সব লেখক জুটলেন, তাঁদের কলম দিয়ে অন্য আর কিছু বেরুল না, বেরুনো সম্ভবও ছিল না, কারণ সত্যিই ওঁরা সবাই যৌনক্ষুধায় ছটফট করছিলেন—

সে। ভালো লেখক পেলেন না?

আমি। প্রথমত পয়সা দেবার ক্ষমতা ছিল না, দ্বিতীয়ত ভালো লেখক নেই।

সে। নিজে কাগজ বার না করে প্রতিষ্ঠিত কোনো পত্রিকায় লিখলেই পারতেন।

আমি। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার লেখা কেউ ছাপতে চাইলে না—সর্বত্রই ক্লিক।

চুপ করে বসে রইলাম দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে। স্টোভটা এখনও জ্বলছে।

একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল জানালাটা। ওর মাথার কাপড় সরে গেল, অলক উড়তে লাগল।

সে। প্রেসের বিল শোধ করতে পেরেছেন?

মুচকি হাসলে একটু। আলো নিবে গেল।

"ওহে করুণাসিন্ধু, তোমার ছেলেটা যে একেবারে অধঃপাতে গেল, সামলাও ওকে—"

"কি করে সামলাব বল, পরামর্শ দাও, শাসন করতে তো ত্রুটি করি না—"

"তোমার শাসনের দৌড় বোঝা গেছে; শাসনকর্ত্রী আমদানি কর টুকটুকে দেখে একটি, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

হাপরের মতো একটা শব্দ হল, গৌরীশঙ্করবাবু হাসলেন।

"তারও চেষ্টা করছি। মিনতিকে আনিয়েছি—"

"মিনতিটি কে?"

"আমার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। বেচারা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে, মেয়েটির বিয়ে দিয়ে যেতে পারে নি—"

"মেয়েটি কেমন?"

"ভারী লক্ষ্মী, যেমন স্বভাব, তেমনই সংসারের কাজকর্মে, মুখে কথাটি নেই—"

"আরে, দেখতে কেমন?"

"দেখতে অবশ্য ডানাকাটা পরী নয়, গেরস্ত-ঘরের মেয়ে সাধারণত যেমন হয়, তেমনই—"

"কিন্তু ও মেয়ে তোমার বিলেত-ফেরত ছেলের মনে ধরবে কি?"

"ধরতেই হবে।"

"যদি না ধরে, কি করবে তুমি?"

"বাড়ি থেকে দূর করে দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব, মিনতির পাত্রের অভাব হবে না।"

"তুমিই খরচ করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে বলছ ?"

"নিশ্চয়ই। মৌখিক বন্ধুত্ব করি না আমি কারও সঙ্গে। অখিল আমার 'ফ্রেণ্ড' ছিল না, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।"

"কিন্তু মেয়ে কি তোমার ছেলের উপযুক্ত ?"

"আমার ছেলে ও মেয়ের উপযুক্ত কি না তাই আমি ভাবছি।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা চিরকালই স্বল্পভাষী, বেশি কথা বলেন না। গৌরীশঙ্করবাবুই আবার কথা বললেন।

"ওই মালতীই ওর মাথা খেলে। তারিণীবাবু আর জগৎ-বাবুর মুখে যা শুনি, তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় আমার। মাগী একটা পাবলিক নুইসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে হে, অথচ কিছু বলবার জো নেই, রেস্‌পেক্‌টেবল ভদ্রলোকের স্ত্রী—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

বাবা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা প্রফেসার গুপ্তকে পার্মানেণ্ট করলে নাকি ?"

"করতে হল, মানে করতামই। লোকটা তো খারাপ নয়, সত্যিই বিদ্বান লোক। আমি অবশ্য এই উপলক্ষ্যে নিজের কাজ খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছি মাগীর মারফত ;

ভাবলাম, তোমারও হয়তো খানিকটা উপকার হবে তাতে।"

"কি কাজ ?"

"তোমার ছেলে আমার মিলের কুলিগুলিকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিল না ? অবশ্য শেষ পর্যন্ত হত না কিছুই, আমি সর্দারদের সব হাত করে নিয়েছিলাম ; কিন্তু আমি ভাবলাম এই উপলক্ষ্যে তোমার ছেলের মতিগতিটা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি ! দেখা করলাম মাগীর সঙ্গে একদিন গোপনে, তার হাতে প্রফেসার চক্রবর্তীর জবানিতে লেখা একখানা চিঠিও দিয়ে এলাম, চিঠিখানা অবশ্য লিখেছিল আমার কেরানী যুগল। মাগীকে বললাম, আপনি যদি প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এই চিঠিখানা দেখান তাকে, তা হলে হয়তো ছোকরা সামলে যেতে পারে, অমন একটা ভালো ছেলে অনর্থক বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করছে তো বেফয়দা, আমরা বললে শোনে না, আপনি বললে শুনবে, বিশেষত আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে জানলে ঠিক শুনবে, এ শহরে আপনার কথাই ও মানে কেবল। রমেশবাবু পার্মানেণ্ট নিশ্চয়ই হবেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে ক্যান্‌ভাস্‌ করছি তাঁর জন্যে। তারপর মাগীকে মিনার্ভাখানায় বসিয়ে বেশ লম্বা এক চক্কর দিয়ে নিয়ে এলুম—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

বাবা বললেন, "আমার আর তাতে কি লাভ হল বল ?"

"হ্যাঁ, এখন দেখছি কিছুই লাভ হয়নি। ও যে কলকাতায় গিয়ে কাব্যি করবে, তা তো ভাবতে পারি নি। মাসিক-পত্রের কি নাম হে—অ্যাঁ—টর্চ! আর ওতে গুষ্টির পিণ্ডি কি যে লেখে ওরা, তার তো কোনও হদিসই পাই না! দেখেছ তুমি?"

"না। শুনেছি, উঠে গেছে কাগজটা।"

'অ্যাঁ! উঠে গেছে! ফিরেছে নাকি প্রেমসিন্ধু কলকাতা থেকে? আবার আমার মিল নিয়ে না পড়ে।"

"ফেরে নি বোধ হয়। দেখি নি তো!"

আমি কিন্তু একটু আগেই ফিরেছিলাম, পাশের ঘরে চোরের মতো দাঁড়িয়ে শুনছিলাম সব।

হঠাৎ কপাট ঠেলে একজন ঢুকল।

"এইটেই কি করুণাসিন্ধুবাবুর বাড়ি?"

গলার স্বরে চিনলাম, প্রেস-ওলা।

"আমিই করুণাসিন্ধু। কি চান?"

"ও আপনিই? নমস্কার। প্রেমসিন্ধুবাবু আপনারই ছেলে?"

"হ্যাঁ। কি দরকার?"

"তিনি আমার প্রেস থেকে একখানা কাগজ বার করতেন। কাগজখানা উঠে গেছে, কিন্তু আমার বিল এক পয়সাও পাই নি এখনও।"

"সে তো কলকাতাতেই আছে, তার কাছেই যান।"

"তিনি কলকাতায় নেই—"

"নেই? আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা হলে বলব আপনার কথা। আপনার নামঠিকানা রেখে যেতে পারেন।"

"কিন্তু যতদূর শুনেছি, তাঁর হাতে একটি পয়সা নেই। আপনি যদি পেমেণ্টটা করে দিতেন, বড় উপকৃত হতাম।"

"আমি পেমেণ্ট করব কেন? আমি তো আপনার প্রেস থেকে কিছু ছাপাই নি।"

"তা জানি। কিন্তু আপনার নামের খাতিরেই আমি ধার দিয়েছিলাম আপনার ছেলেকে।"

"আমার নামের খাতিরে! আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই, শোনা নেই, কিছু নেই, অথচ—"

"আপনি একজন বিখ্যাত ব্যাবসায়ী—"

"মাপ করবেন, আমি দিতে পারব না—"

প্রেস-ওলা চলে যাচ্ছিল, বাবা ডাকলেন তাকে।

"একটি শর্তে আপনার বিল শোধ করে দিতে পারি।"

"কি বলুন?"

"যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ওর সঙ্গে বা ওর মতো কোনো ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে ধারে আর কখনও কারবার করবেন না—"

"এ রকম প্রতিজ্ঞা করা কঠিন। কারবার করতে গেলেই ধার দিতে হয়—"

"লোক বুঝে দেবেন।"

"বোঝা যায় না সব সময়। প্রেমসিন্ধুবাবুকে দেখে কারও

বোঝবার সাধ্যি নেই যে, তিনি টাকা মেরে দিতে পারেন। অথচ দেখুন—”

“সে কোথা আছে জানেন ?”

“আমার যতদূর খবর, তাঁর এখানেই আজ আসার কথা। কদিন থেকে অবশ্য তিনি সিনেমায় ঢোকবার জন্মে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু সেখানে কিছু হয় নি শুনলাম।”

“আপনি এ শর্তে রাজী নন তা হলে ?”

“যে শর্ত পালন করতে পারব না, তাতে রাজী হই কি করে বলুন ? আচ্ছা, চলি। নমস্কার।”

“শুনুন, কত টাকার বিল আপনার ?”

“পাঁচ শো বত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা—আমার যাতায়াত-খরচা সুদ্ধ ধরেই বলছি।”

ড্রয়ার টানার শব্দ পাওয়া গেল।

বাবা চেক লিখে দিলেন।

“এই নিন। আপনাকে আমি টাকাটা দিতাম না, দিলাম কেবল আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে। এ রকমটা প্রায় দেখা যায় না এ দেশে।”

অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায় নিলে প্রেস-ওলা। হাপরের শব্দ হল।

“তোমার কাজকর্মই সব আলাদা রকম দেখছি। আচ্ছা, উঠি এবার।”

দৃশ্য বদলাল।

সকাল হয়েছে, অন্য দিনের চেয়ে একটু যেন বেশি গরম লাগছে আজ। ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনস্পর্শী তুষার-প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে যতদূর দৃষ্টি চলে। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, কাছে দূরে তুষার-প্রপাতের শব্দ শুনেছি সারারাত ধরে, কেমন যেন একটা নিরুদ্ধ গম্ভীর গর্জন, আমাদের আগমনে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন অবরুদ্ধ রোষে গজরাচ্ছে। অস্পষ্ট একটা আশঙ্কা সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে সারারাত কাল তন্দ্রার মধ্যে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম চারিদিকে, একটা ঘন কুয়াশা মন্থর গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে, সূর্য উঠেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

এখুনি বেরুতে হবে, আরও খানিকটা উঠে তিন নম্বর তাঁবু গাড়বার কথা আজ, ওই উঁচু ফালি বারান্দার মতো জায়গাটায়। সঙ্গীরা সব বেরিয়ে পড়েছে, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের, ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো শুভ্র তুষারের বিরাট পটভূমিকায়। আমাকেও বেরুতে হবে এইবার। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকতে যাব, নিদারুণ একটা গর্জন শুনে ফিরে দাঁড়ালাম।

এ কি দৃশ্য! কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনচুম্বী তুষার-প্রাচীরের বিরাট একটা অংশ ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্যের মতো হিমানী-স্তূপ হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ছে একসঙ্গে, লক্ষ লক্ষ বিচূর্ণিত

তুষারকণা মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলছে চতুর্দিক, গগন-বিদারী শব্দে চরাচর প্রকম্পিত হচ্ছে, ভয়ঙ্কর ভীম গর্জনে যেন নেমে আসছে রুষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার শব্দায়িত শাসন অনিবার্য করাল বেগে, নেমে আসছে একসঙ্গে কঠিন তরল বাষ্পীয় হিমানী-সম্ভার প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্য করতে করতে...

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছি। মনে হচ্ছে, সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পেয়েছে, চোখের সামনে দেখতে দেখতে অবলুপ্ত হয়ে গেল ছোট ছোট কালো বিন্দুগুলি, অগ্রগামী সঙ্গীরা বিরাট বরফস্তূপে চাপা পড়ে গেল নিমেষের মধ্যে, জড়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদের জীবন্ত সমাধি। সহসা চেতনা হল, ক্যাম্পের ভিতর থেকে বরফ-কাটা কোদাল বার করে ছুটলাম, বরফ সরিয়ে ওদের তুলতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে ওদের—উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি—স্মাইদ নয়, আমি।

দৃশ্য বদলাল।

নীরব নিথর চতুর্দিক। নির্মল নিখুঁত কালো আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলছে যেন কষ্টিপাথরে বসানো মণির মতো, অসংখ্য উজ্জ্বল মানিক জ্বলছে, আমার মনের গহন অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে তাদের শুভ্র নির্মল কিরণস্পর্শে। অনুভব করছি, আমি ছোট নই, হীন নই, তুচ্ছ নই, ওই জ্যোতিষ্কদের সগোত্র

আমি। হিমালয়ের উপত্যকায় শুয়ে আছি, চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পর্বতমালা নিশ্চল বিরাট গাম্ভীর্য নিয়ে, অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে তাদের আকাশের দিকে চেয়ে। নির্নিমেষে চেয়ে আছি মহাশূন্যে, তারার মিছিল চলেছে অনাদিকাল থেকে, আমিও চলেছি তাদের সঙ্গে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছু নেই, অনন্ত অনাদি অখণ্ড কালের প্রবাহে নিখিল বিশ্ব ভেসে চলেছে, আমাদের সৌরজগৎ তার মধ্যে এক বিন্দু কিরণ-কণিকা মাত্র, হিমালয় দেখা যাচ্ছে না। অথচ কি বিরাট বিপুল বিশাল এই হিমালয়!

শুয়ে শুয়ে ভাবছি। তপস্বীর সাধনাক্ষেত্র, তাপিতের তীর্থস্থান, ভারতবর্ষের মহিমার প্রতীক এই হিমালয়, স্বয়ং মহাকাল এখানে ধরা দিয়েছেন উমার কোমল বাহুবন্ধনে, এই হিমালয়ের শীর্ষে পদার্পণ করে সদম্ভে পতাকা রোপণ করবার মতো ধৃষ্টতার কল্পনাও করতে পারি না আমরা ইয়োরোপীয় নাস্তিকদের মতো···ভাবছি, কত কি ভাবছি, ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌-ব্যাণ্ড নয়, আমি।

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে।

সে। সিনেমা থেকে বিফলমনোরথ হয়েই বুঝি হিমালয়ে বিবাগী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখলেন!

আমি। ভারতবাসীর পক্ষে বৈরাগ্যটা নতুন জিনিস নয়, বৈরাগ্যই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সে। তাই নাকি!

আমি। আমাদের রক্তের মধ্যে ওর বীজ নিহিত আছে, তাই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক ছুঁচোটাকে গলাধঃকরণ করেও আত্মসাৎ করতে পারছি না। বিপদে পড়েছি কেবল।

সে। আপনার হিমালয়-অভিযানের প্রথম স্বপ্নটা কিন্তু খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক স্বপ্ন।

আমি। স্মাইদের কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বইখানা মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, হিমালয়ের কথা মনে হতেই আগে ওই ধরনের স্বপ্ন মনে জাগল। তারপর মনে হল, না, ইয়ংহাসব্যাণ্ডের মতটাই ঠিক। সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে হিমালয়ের মহত্ত্বে অভিভূত হতে পারলে হিমালয় অমৃত দান করেন, কৈলাস-পর্বতে স্বয়ং দত্তাত্রেয় সশরীরে দেখা দেন,

ভগবান শ্রীহংসকে যেমন দিয়েছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের মাথায় পা তুলে দেবার স্পর্ধা করলে পাওয়া যায় কেবল দুঃখ, হতাশা আর মৃত্যু। ভারতবাসী হিন্দু হিমালয়কে যে চোখে দেখে তাই প্রকৃত হিমালয়-দর্শন। ইংরেজদের ছোঁয়াচ লেগে আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

সে। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন কেন?

আমি। আর একটা স্বপ্ন দেখে।

সে। স্বপ্নে যদি মিনতি আসত, ফিরতেন?

আমি। বলতে পারি না।

সে। স্বপ্ন বলছেন কেন, বলুন মালতীর জন্যে ফিরেছি।

আমি। তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি, মালতীই বা কম কিসে? হিমালয়ের তুষারমৌলি উচ্চতা ওর আছে কি না জানি না, কারণ এখনও ওর মনের শিখর অনাবিষ্কৃতই আছে, কিন্তু হিমালয়ের লতা-গুল্ম-বনস্পতি-শোভিত পশু-পক্ষী-পতঙ্গ-সরীসৃপ-সমন্বিত নিবিড় অরণ্য-রহস্য মালতী-চরিত্রে আছে। সত্যি যদি ওই অরণ্যে কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে, সে আনন্দ পাবে নিশ্চয়।

সে। আপনি পেয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত তা হলে তিব্বতী নাল্‌জোরপার ভয়াবহ তান্ত্রিক স্বপ্ন দেখতে হল কেন আপনাকে আত্মবিলোপ কামনা করে?

আমি। আমি ভীরু, একটা সরীসৃপ দেখে ভয়ে ঘৃণায় পালিয়ে এলাম। তা ছাড়া আত্মবিলোপেও কি আনন্দ নেই ?

সে। আছে। কিন্তু তা পদাহত কুকুরের গ্লানিকর আত্মবিলোপ নয়। তা ছাড়া আপনি তিব্বতী চয়েদের স্বপ্ন দেখেছেন ডেভিড নীলের কেতাবখানা পড়ে। সত্যি সত্যি তা করবার সাধনা বা সাধ্য আপনার নেই। অতি সাধারণ রাসায়নিক পন্থাই অবলম্বন করতে যাচ্ছেন তাই সস্তা নাটকীয় ভঙ্গীতে।

মনে হল, তার চোখের দৃষ্টি যেন অগ্নিশলাকার মতো আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করছে।

আলোটা নিবে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে দেখলাম, জানালা দিয়ে এক ফালি সোনালী রোদ এসে পড়েছে মালতীর কাঁধে, বাহুমূলে, বুকে। খোলা বই একখানা পড়ে আছে কোলের উপর, কিন্তু পড়ছে না সে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে আছে ঋজু বলিষ্ঠ ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে।

আমাকে দেখে তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, মনে হল, যেন একটু আনন্দও।

"একি, তুমি দার্জিলিং থেকে ফিরেছ কবে?"

"কাল—"

"তুমি দার্জিলিং যাবে জানলে আমিও যেতাম তোমার সঙ্গে। ডক্টর মজুমদার চেঞ্জে যেতে বলছেন কতদিন থেকে, সঙ্গী অভাবে যেতে পারছি না, ওঁর মোটে অবসর নেই—"

ক্ষণিকের জন্যে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল অধর-প্রান্তে। বেশবাস সম্বৃত করে সোফার এক ধারে সরে বসল।

"বোসো—"

"রমেশ কোথা?"

"তিনি তো নেই, লক্ষ্ণৌ গেছেন, বি. এস-সির পরীক্ষক হয়ে—"

বসলাম। বইটা তুলে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথের কাব্য। 'দুরন্ত আশা' কবিতাটা খোলা রয়েছে। ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুঈন—কবিতাটা যেন পেয়ে বসল আমাকে। পড়তে লাগলাম।

হঠাৎ দার্জিলিং চলে গেলে যে? শুটিং ছিল নাকি?"

"শুটিং? না।"

"তবে?"

"আমি সিনেমায় ঢুকতে পারি নি।"

তাই নাকি? কেন, কি হল?"

"বললে, যোগ্যতা নেই।"

"যোগ্যতা নেই? বল কি? তোমার চেয়ে ভালো অভিনেতা তো বড় একটা দেখা যায় না—"

"ভালো নাটক বা ভালো অভিনেতা হলেই যে সিনেমায় স্থান পাবে, এমন কোনো কথা নেই। অন্য গুণও থাকা দরকার--"

"আবার কি গুণ?"

"রাম-শ্যাম-হরি-যদুকে মুগ্ধ করতে পারার গুণ।"

"সে গুণও তো তোমার আছে। শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা হতে পেরেছিলে যখন—"

"থাক, ওসব আলোচনা করতে ভালো লাগছে না—"

বইটা রেখে দিলাম। তার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম ক্ষণকাল নির্নিমেষে, তারপর বললাম, "মালতী, তোমার কাছে এসেছি আমি—"

"চা আনতে বলি?"

"না থাক—"

"অন্য কিছু?"

"না—"

মালতী একটু নড়ে-চড়ে বসল। গায়ে গা ঠেকল। হঠাৎ কেমন যেন আত্মসংযম হারিয়ে ফেললাম, ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ল এক মুহূর্তে। আবেগভরে তার হাত দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত গদগদকণ্ঠে বললাম, "কাল সমস্ত দিন আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু পারলাম না, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে আসতেই হল, তুমি আমাকে যেতে দিলে না—"

"আমি যেতে দিলাম না মানে?"

"হ্যাঁ, তুমিই। আমার এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে না পেরে বিবাগী হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, বিশ্বাস কর, নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলাম হিমালয়ের দিকে—"

"একটা উদ্দেশ ছিল তা হলে, একেবারে নিরুদ্দেশ নয়—"

ঘাড় বেঁকিয়ে চাইলে আমার দিকে স্মিতমুখে

"নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার মুখে আমাকে দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছিলে যখন—চিঠিও অদ্ভুত চিঠি, প্রকাণ্ড একটা কাগজে মাত্র একটি লাইন—আমি এখানে এসেছি।"

"পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলতে পারতাম। রমেশের ভয়ে পারি নি—"

চুপ করে রইলাম ক্ষণকাল, এই ইঙ্গিতটা ওর মনে কোনো রেখাপাত করল কি না, তা দেখবার জন্যে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"তারপর ?"

"তারপর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন তুমি আমাকে ডাকছ—"

"তাই ফিরে এলে ?"

ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ময় প্রকাশ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু চাপা হাসি ফুটে উঠল চোখের কোণে।

"আমি সত্যিই অতি হতভাগ্য মালতী, উপহাস কোরো না আমাকে।"

"সত্যি স্বপ্ন দেখে ফিরে এসেছ ?"

"সত্যি—"

"নিছক স্বপ্নকে এতটা মূল্য দেওয়ার মতো কুসংস্কার তোমার আছে, তা তো জানতাম না।"

"স্বপ্ন কুসংস্কার নয়, স্বপ্নতত্ত্ব আজকাল বিজ্ঞানের অঙ্গ। টেলিপ্যাথি—"

"টেলিপ্যাথি মানো ?"

"মানি। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিই মনে মনে তুমি ডাকছিলে আমাকে—"

"তুমি নিজের সুবিধেমত যখন যেটা খুশি বিশ্বাস কর। বিলেতে আমার চিঠিটাই তুমি বিশ্বাস করেছিলে টেলিপ্যাথিটা কর নি—"

"চিঠির ভাষা এত স্পষ্ট ছিল যে, তা অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না কোনও—"

"ভালো করে পড়েছিলে চিঠিটা ?"

"বহুবার। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছি কবচের মতো—"

"অত না করে শেষের প্যারাগ্রাফটা যদি মন দিয়ে পড়তে, তা হলেই বুঝতে পারতে। তুমি বুঝেও ছিলে, কিন্তু—যাক।"

"কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারি নি, মিথ্যে করে ওরকম চিঠি তুমি লিখলে কেন!"

"একটা উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ প্রত্যাশা করে। দিনের পর দিন কাটিয়েছি তোমার উত্তরের আশায়। রমেশের নামটা পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলাম উত্তরটা ফেরত ডাকেই পাব এই ভেবে। উত্তর এসেছিল, অনেকদিন পরে, এবং এক কথায়—'তথাস্তু'। মনে হল তুমি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলে।"

"রমেশকে ভালোবাস না তুমি ?"

"খুব। তোমার কি বিশ্বাস, জীবনে একবারের বেশি ভালোবাসা যায় না ?"

চুপ করে রইলাম।

মালতীও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললে "তোমাকে কিন্তু বাহাতুরি দিই। পরীক্ষা না দেওয়ার যে ওজুহাতটা বার করেছিলে, তা সত্যিই চমৎকার। শুধু অসুখ নয়, একজন নামজাদা খাঁটি বিলিতি এম. ডি. এফ. আর. সি. পির সার্টিফিকেট সুদ্ধ পাঠিয়ে দিলে বাবার কাছে। 'স্লীপিং সিকনেস' অসুখটার নামই শুনি নি আমরা তার আগে। ও দেশের অত বড় ডাক্তারও যে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে পারে, তাও ধারণাতীত ছিল।"

"সত্যি আমার স্লীপিং সিকনেস হয়েছিল—"

'সত্যি ? কি করে হল ও অদ্ভুত অসুখ ?"

"ডাক্তার রবিন্‌সন বলে একজন ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল। স্লীপিং সিকনেস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। কথায় কথায় একদিন তিনি বললেন জানোয়ারের উপর একস্‌পেরিমেণ্ট করে তৃপ্তি হচ্ছে না তাঁর, একজন সুস্থ সবল মানুষের ওপর একস্‌পেরিমেণ্ট করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কেউ রাজী হচ্ছে না। ঠিক তার তু দিন আগে তোমার চিঠিখানা পেয়েছিলাম, আমি রাজী হয়ে গেলুম। একটি শর্ত ছিল

কেবল, কোনো কারণেই আমার নাম বা ছবি সে প্রকাশ করবে না কারও কাছে—”

সভয় বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে—মেকি নয়, আন্তরিক। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

“এ কথা তো বল নি একদিনও!”

“প্রয়োজন ছিল না—”

“এ অসুখে লোক মারা যায়?”

“যায় বইকি। রবিনসনের চিকিৎসানৈপুণ্যেই বেঁচে উঠলাম আবার। কিন্তু মনে হচ্ছে মারা গেলেই ছিল ভালো।”

“এ গোঁয়ারতুমি করবার কি দরকার ছিল? আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করা শক্ত, ফেল করা তো সোজা—”

“সোজাসুজি ফেল করলে এ দেশে মুখ দেখাতে পারতাম না, বিশেষত তোমার বাবার কাছে—”

“আমাকে এ কথা বল নি কেন এতদিন?”

মনে হল, গলার স্বরটা কাঁপল একটু।

“বললাম তো, প্রয়োজন মনে করি নি। তা ছাড়া আমার বন্ধু রমেশেরই সঙ্গে যখন সত্যি সত্যি তোমার লাভ-ম্যারেজ হল তখন প্রয়োজনটা আরও কমে গেল—”

“আজ বলছ কেন?”

“আজ তোমার প্রণয় ভিক্ষা করতে এসেছি, নির্লজ্জের

মতো এসেছি, রমেশের প্রতি অবিচার করছি, তা জেনেও এসেছি। বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার কোথাও আর আশ্রয় নেই। সত্যি সত্যি আশ্রয় দিতে যদি না-ও পার, ভান কর অন্তত, তাতেই আমি কৃতার্থ হব—"

হঠাৎ চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বালা ফুটে উঠল তার, মনে হল যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চকমক করে উঠল।

"ভানের কথা উঠছে কেন ?"

"কারণ তোমায় আমি ভালোবাসি, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। রমেশের চাকরি সম্পর্কে প্রফেসার চক্রবর্তীর যে চিঠিটা আমাকে দেখিয়েছিলে, সেটা যে জাল চিঠি তা তুমি জানতে। গৌরীশঙ্করবাবু নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে তোমাকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, খুব সম্ভবত তোমার সম্মতিক্রমেই।"

"কি করে জানলে তুমি ?"

"স্বকর্ণে শুনেছি গৌরীশঙ্করবাবুর নিজের মুখ থেকে।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি এ নিয়ে ?"

"আর একজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।"

চুপ করে রইল ; কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, জ্বলছে চোখ দুটো।

দরজা ঠেলে একজন বেয়ারা ঢুকল। হাতে প্রকাণ্ড একটা

ট্রে, রুপোর মিনে-করা, সুদৃশ্য দামী তোয়ালে দিয়ে কি যেন ঢাকা দেওয়া রয়েছে তাতে।

গৌরীশঙ্করবাবু ভেট পাঠিয়েছেন।

তোয়ালেটা তুলে দেখালে, এক ট্রে ভরতি বড় বড় লাল লাল আপেল।

অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে মালতী বললে—"হঠাৎ ভেট কেন!"

ট্রেটা সামনের তেপায়ার উপর নামিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল নীরবে।

আমি বললাম, "গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে আমাকেও যেতে হবে। তাঁর মিলগুলোর জন্যে একজন ম্যানেজার রাখবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম আজকের কাগজে। ওই চাকরিটার জন্যে যাব তাঁর কাছে।"

"তুমি! গৌরীশঙ্করবাবুর অধীনে চাকরি নিতে যাবে?"

"না গিয়ে উপায় নেই। এ শহরে থাকতেই হবে আমাকে। নিজের বাড়িতে থাকতে পারব না, কারণ বাবা নোটিশ দিয়েছেন—মিনতিকে বিয়ে না করলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। গৌরী-শঙ্করবাবুর মিলের চাকরিটা নিতেই হবে যেমন করে হোক—"

"যদি না পাও?"

"না পেলে কি করব, তা এখনও ঠিক করি নি। তবে মিনতিকে বিয়ে করব না, এটা ঠিক।"

মালতী মুখ টিপে হাসলে একটু।

স্টোভের আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মালতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ক্ষণকাল পূর্বে তার চোখে-মুখে যে জ্বালা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, হাসির স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে সেটা।

"মিনতিকে বিয়ে করতে এত আপত্তি কেন? মেয়েটি তো ভালো শুনেছি, খুব গৃহকর্মনিপুণা—"

"হ্যাঁ, খুব। তার অতি-ব্যগ্র সেবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরও পালিয়ে এলাম আমি তোমার কাছে—"

"কেন, কি হয়েছে?"

"দার্জিলিং থেকে নামবার সময় অসাবধানে পা-টা মচকে গেছল হঠাৎ। বাড়িতে এসে চাকরটাকে বললাম, একটু গরম জল করে দিতে শেক দেবার জন্যে। মা থাকলে মা-ই সব করতেন, কিন্তু তিনি এখানে নেই, বদ্যিনাথ গেছেন। খানিকক্ষণ পর দেখি, গরম জলের কেতলি, ফরসা ন্যাকড়া, ফরসা তোয়ালে হাতে করে মিনতি এসে উপস্থিত—আমার পায়ে শেক দেবে বলে। শুধু একবার নয় কাল থেকে ক্রমাগত তিন চার ঘণ্টা অন্তর আসছে তার মায়ের ইঙ্গিতে আমার পদসেবা করবার জন্যে, যাতে আমি ওকে পছন্দ করি। সিকেনিং!"

"ওর মা সুদ্ধ এসেছে নাকি!"

"হ্যাঁ, মা পিসীমা কাকীমা মামা কাকা সবাই। বাবা আনিয়েছেন। মিনতির বিয়ে দিয়ে তবে যাবে সব।"

"বাড়ি তা হলে সরগরম বল।"

"একতলা দোতলায় তিল ধরবার স্থান নেই। ভাগ্যে তেতলার ঘরটা ছিল, আর ভাগ্যে বাইরে থেকে তাতে ওঠবার সিঁড়ি ছিল, তা না হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।"

"চাকরিটা যদি না পাও কি করবে?"

"আর যা-ই করি ও বাড়িতে আর থাকব না। ও বাড়িতে আজ রাত্রেই বোধ হয় শেষ থাকা—"

"আমার এখানে থাকতে পারতে, কিন্তু সেটা কি একটু বেশি দৃষ্টিকটু হবে না? তোমার বন্ধুটি থাকলে কোনো কথাই ছিল না।"

"না, আমি এ বাড়িতেও থাকব না। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীরা এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে—"

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তার চোখের দৃষ্টিতে আমি যে কি দেখতে পেলাম জানি না, হঠাৎ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

"একটা অনুরোধ রাখবে আমার?"

"কি বল—"

"চাকরিটা যদি না পাই, হয়তো এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়, হয়তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না আর

আমার জীবনে, কিন্তু তার আগে তোমাকে একবার পেতে চাই—মাত্র একবার। আসবে তুমি আমার তেতলার ঘরটায় আজ রাত্রে? দরজা খুলে রাখব আমি, বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কেউ টের পাবে না।”

“ছি ছি, কি মনে কর তুমি আমাকে! হাত ছাড়—”

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য বদলাল।

হাপরের মতো হাসিটা যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে অশরীরী প্রেতের মতো।

“তোমাকে আমার মিলের ম্যানেজার করব? তোমাকে? অঁ্যা, বল কি? আশা কর তুমি? কি আপদ!”

দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

দৃশ্য বদলাল।

শ্মশান। অন্ধকার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি একা।

হাতে বাঁশি—হাড়ের বাঁশি—উরুতের হাড় থেকে তৈরী তিব্বতী নাল্‌জোরপার কাংলিং। সজোরে ফুৎকার দিয়ে বীভৎস তান তুলেছি তাতে, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজছে তার তালে তালে। আত্মবিসর্জন দিতে এসেছি। সাগ্রহে আহ্বান করছি—কোথায় আছ, ক্ষুধিত তৃষিত প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-

যোগিনীর দল, এস, নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর আমার, নিঃশেষ কর আমাকে···আমার অন্তরের আগ্রহ সহসা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল আমার মাথা ভেদ করে। জ্বলন্ত শিখার মতো খড়্গ-ধারিণী নারীমূর্তি। খড়্গের এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেললে আমার মস্তক, ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হল শোণিত-ধারা। রক্তপিপাসু প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল ভিড় করে এসে দাঁড়াল চারিদিকে। খড়্গধারিণী আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিতরণ করতে লাগলেন তাদের। ছিন্ন করলেন হস্তপদ, ছাড়িয়ে ফেললেন গায়ের চামড়া, উৎপাটিত করলেন চক্ষু, বিদীর্ণ করলেন উদর, অন্ত্রগুলো বেরিয়ে ঝুলতে লাগল, বইল রক্তের স্রোত, প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীরা আহারে প্রবৃত্ত হল লুব্ধ আগ্রহে, তাদের সশব্দ চর্বণে অন্ধকার মুখরিত হতে লাগল।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর আপিস থেকে বেরিয়ে আপনি শ্মশানে চলে গেলেন কোন্ আশায়?

আমি। কোথা যাব আর?

সে। ধাপে ধাপে যখন নাবতেই শুরু করেছিলেন, তখন এর পরের ধাপে বাবার কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল আপনার অনুতপ্তচিত্তে।

চুপ করে রইলাম।

সে। শ্মশানের বাঁধানো চাতালে বসে তিব্বতীয় কল্পনা-বিলাস করতে করতে হঠাৎ উঠে পড়লেন কেন?

আমি। ভয় করতে লাগল।

আবার ওকে ঠকাবার চেষ্টা করছি।

সে। ভয় করছিল অবশ্য একটু একটু, কিন্তু আপনি উঠে পড়লেন টেলিপ্যাথির প্রতি বিশ্বাসবশত। আপনার মনে হতে লাগল, মালতী আপনাকে ডাকছে। এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ঠিক হত, না?

আলো নিবে গেল।

অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ভাবছি, মালতীর কাছে মুখ দেখাব কি করে; ভাবছি, মালতী কি বলবে; ভাবছি, মালতীকে ছেড়ে যাব কি করে! কিন্তু যেতেই হবে, এ শহরে আর মুখ দেখাতে পারব না। ভাবছি, মালতীকে ক্ষণিকের জন্যও একবার চাই; ভাবছি, আর একবার বলব তাকে আমার তেতালার ঘরটাতে যেতে, পায়ে ধরব তার···

ওপরে উঠে দেখি, মালতীর ঘরে কেউ নেই। পাশেই রমেশের ল্যাবরেটরি, কপাট ভেজানো, কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কপাট ঠেলে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল, ভূমিকম্প হচ্ছে, বিশ্বাস হচ্ছে না কিছু, দৃষ্টি প্রলাপ দেখছে। মালতী আর গৌরীশঙ্কর! মালতী গৌরীশঙ্করের গলা জড়িয়ে আদর করছে। খানিকক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙল, দেখলাম, ভূতের মতো আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি···ঘরে কেউ নেই···দুজনেই বেরিয়ে গেছে···

মনে হল, এ যেন ল্যাবরেটরি নয়, শ্মশান। শ্মশানে সেই প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল আবার ঘিরে ধরেছে আমাকে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে না, আমি যেন সাগ্রহে বলছি—খাও, খাও, আমি পাপী, আমি মূর্খ, আমি ঋণী, আমার জীবন নিয়ে মুক্তি দাও আমাকে···হঠাৎ দেখলাম, সামনে একটা শেল্ফ রয়েছে। তার ওপর ছোট একটা শিশি। তার গায়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা—সোডিয়ম সায়ানাইড।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। সায়ানাইড খেলে সত্যিই কি মুক্তি পাবেন আপনি? সত্যিই কি অঋণী হয়েছেন?

চুপ করে রইলাম।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল সে হাসি, ক্রমশ একটা জ্যোতির্মণ্ডলের মতো হয়ে উঠল দেখতে দেখতে, সে তার মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসেই রইলাম।

হঠাৎ দেখি, দ্বারপ্রান্তে শীর্ণকান্তি দীর্ঘদেহ কে একজন দাঁড়িয়েছে এসে।

"কে?"

"আমি যতীন—"

"যতীন? কোথা থেকে এ সময়ে?"

"কয়েকদিন হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমায় একটু জায়গা দিতে পারিস ভাই?"

"জায়গা? কেন, কি হয়েছে তোর?"

"টি. বি.।"

"বাড়ি যাস নি?"

"বাড়ি ফেরবার আর মুখ নেই। আমার জন্যে বাবার চাকরি গেছে, দাদার চাকরি গেছে, ভাই নজরবন্দী হয়ে আছে, অবিবাহিত বোনটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"কোথা আছিস তুই এখন ?"

"এখন কোথাও নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। জেল থেকে বেরিয়ে চেনাশোনা একটা মেসে এসে উঠেছিলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে তারা আর রাখতে চাইলে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। একটু জায়গা দিতে পারিস আমাকে, বেশি নয়, শুধু মরবার মতো জায়গা একটু—"

বাইরে কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"বাইরে কেউ আছে নাকি ?"

"ছোট একটা ভিখিরীর ছেলে। কদিন আগে ওর মা মারা গেছে রাস্তায় অনাহারে। ছেলেটা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, আমি এক পয়সার মুড়ি কিনে দিয়েছিলাম, সেই থেকে সঙ্গ ছাড়ছে না কিছুতেই। আয়, ভেতরে আয়, কাঁদছিস কেন, আমি যদি জায়গা পাই, তুইও পাবি, আয়।"

এল—

জীর্ণ-শীর্ণ সাত-আট বছরের ছেলে একটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার চুল রুক্ষ, কটা। গা-ময় খোস, চোখ উঠেছে, গালের উপর চোখের জলের দাগ। যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে পিচুটি-ভরা অশ্রুপূর্ণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে সভয়ে। পাশাপাশি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি তাদের বসতে পর্যন্ত বললাম না।

অন্ধকার হয়ে এল।

নিবিড় অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলাম।

আলো জ্বলে উঠল।

সে বসে আছে।

সে। চিনতে পারলেন ছেলেটি কে ?

আমি। না।

সে। বাতাসীর ছেলে হয়তো।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। বাতাসীর ছেলে ?

সে। ভাবছেন কি ?

আমি। বাতাসীর ছেলে কি করে আসবে ?

সে। আপনার দরজা খোলা আছে যে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল আবার। মনে হল, আবার আসছে তারা। সে উঠে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মালতী। হু-হু করে একটা কনকনে বাতাস ঢুকল জানলা দিয়ে, আমার ব্যর্থ জীবন-কাহিনীর-পাতাগুলো উড়তে লাগল এলোমেলো হয়ে ঘরের চারিদিকে।

মাথার খোঁপাটা দু হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে মালতী এসে বসল আমার সামনে। হাওয়ার বেগে লালপেড়ে কমলা-রঙের শাড়িখানা আঁটসাট হয়ে বসে গেল তার নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি তুলে সে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার পানে। আমিও চেয়ে রইলাম।

"তুমি ডেকেছ বলে আসি নি, আমি এসেছি আমার

নিজের গরজে। আমাকে তুমি কোনোদিন বুঝতে পার নি, আজও হয়তো পারবে না। তবু সরল সত্যি কথাটা বলতে এসেছি, ইচ্ছে হয় বিশ্বাস না-ও করতে পার। এই নাও—”

বুকের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে আমার হাতে। হাতের স্পর্শ পেলাম। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা কনকন করছে। পড়ে দেখলাম, গৌরীশঙ্করবাবু মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে আমাকে তাঁর মিলের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা নিয়োগ-পত্র।

“তুমি জান, আমার টাকার অভাব নেই, আমাকে যদি কিছুমাত্র বুঝে থাক, তা হলে এও তোমার জানা উচিত, ওই জরদ্গব জরাগ্রস্ত মাংসপিণ্ডটার উপর কিছুমাত্র লোভ থাকবার কথা নয় আমার। যুগলবাবুর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে উনি আমার পিছু নিয়েছেন, কিন্তু আমল পান নি এতদিন। আজ স্বচক্ষে তুমি যা দেখেছ তা সম্ভব হয়েছে কেবল তোমারই জন্যে, ও ছাড়া তোমার চাকরি পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি চললাম—”

উঠে চলে গেল কিছুদূর—তারপর আবার ফিরে দাঁড়াল—“আর একটা কথা বলে যাই তোমাকে। সেদিন যখন মদে ভিজিয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের আল্‌টিমেটামটা পুড়িয়ে ফেলেছিলে, একটুও খুশী হই নি আমি। গৌরীশঙ্করবাবু যখন ওই জাল

চিঠিখানা নিয়ে এসে সাধ্যসাধনা করছিলেন আমাকে, তখন আমি রাজী হয়েছিলাম বটে; কিন্তু খুব বড় গলা করে তাঁকে বলেছিলাম—'দেখবেন, প্রেমসিন্ধু কিছুতেই রাজী হবে না। সে রকম ছেলেই নয় ও।' তুমি আমাকে হতাশ করেছ সেদিন। তোমরা জান না, আমরা কি চাই। জান না তুমি, আমার কি সর্বনাশ করলে। জীবনে বহু পদলেহী কুকুরকে প্যাট করেছি; পুজো করতে চেয়েছিলাম একটি মাত্র যে মানুষকে, তুমি পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করলে তাকে—"

চলে গেল।

কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ দেখলাম, সে বসে আছে সামনে।

সে। মালতী যা-ই বলুক, আমি জানি, আপনি সত্যিই একজন আদর্শবাদী ভালো ছেলে। ভুল পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন কেবল।

আমি। একটু পরেই যে লোক জন্মের মতো পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে, ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তাকে?

সে। সত্যি ছেড়ে যাবেন? আর তো যাবার কোনো কারণ নেই। বেঁচে থাকবার যথেষ্ট হেতু তো পেলেন।

আমি। কি?

সে। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে, মালতী আপনাকে ভালোবাসে এবং সে অসতী নয়।

আমি। কিন্তু আমার এই ব্যর্থ ক্ষতবিক্ষত জীবন নিয়ে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।

সে। আপনার জীবন? আপনার জীবন শুরুই তো হয় নি এখনও। এতদিন তো শুধু গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ করলেন কখন যে ক্ষতবিক্ষত হবেন?

আমি। এতদিন তা হলে যা করলাম, সেটা কি?

সে। কিছুই নয়। অপরের শোনা কথা কপচেছেন, অপরের দেখা স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। লেনিনের কথা শুনে কমিউনিজ্‌ম করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখে কাব্য করেছেন; কিন্তু ভুলে গেছেন, আপনার নিজের মূলধন একটি কানা কড়ি নেই।

আমি। মূলধন মানে?

সে। চরিত্র, মনুষ্যত্ব—যা না থাকলে কিছুই হয় না পৃথিবীতে। আপনি কি সত্যিই আপনার দেশকে ভালোবাসেন?

আমি। বিলেত গিয়ে আর কিছু না শিখি, দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি।

সে। সত্যিই যদি দেশকে ভালোবেসে থাকেন, শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকুন জীবনকে। মাটি দেশ নয়, দেশবাসীই দেশ, আপনিই দেশ। আপনার মৃত্যু মানে দেশেরই একটা অংশের মৃত্যু।

আমি। কি করতে বল তুমি তা হলে? এই ঘৃণিত

অস্তিত্বটাকে লাঞ্ছনা-অপমানের মধ্যে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে বল আমরণ ? মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি আছে ?

সে। আছে।

আমি। কি ?

সে। বলতে পারি, যদি ওই সায়ানাইডের পুরিয়াটা জানলা দিয়ে ফেলে দেন আগে।

প্রদীপ্ত চক্ষু দুটি নিবদ্ধ হয়ে রইল আমার মুখের উপর। মনে হল, অমৃতবর্ষণ করছে। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম মোহাবিষ্টের মতো, ধীরে ধীরে গেলাম জানলার কাছে, পুরিয়াটা ফেলে দিলাম।

স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা থেমে গেল হঠাৎ। নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। চেয়ে দেখলাম, সে বসে আছে, একটা মহিমা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। গিয়ে বসলাম।

আমি। এইবার বল।

সে। বিয়ে করুন।

আমি। বিয়ে করব! এই তোমার মুক্তির বার্তা ?

সে। আগে মানুষ হোন, তারপর মুক্তির পথ আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন।

আমি। মানুষ হবার জন্যে বিয়ে করতে হবে ?

সে। তার মানেই দায়িত্ব নিতে হবে।